আয়ুর্ব্বেদ

আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচক

—:o:—

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

—
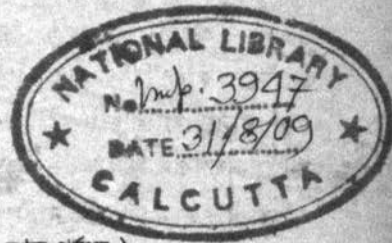
৭ মবর্ষ
(১৩২৯ আশ্বিন হইতে ১৩৩০ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা
১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রীজরোড
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[বার্ষিক মূল্য ৩৷৵৹

৭ম বর্ষের বর্ষ সূচী।

৭ম বর্ষ | ১৩২৯ সাল আশ্বিন | ১ম সংখ্যা

শিশুচর্য্যা।

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

স্তন্য-বৃদ্ধিকর যোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

প্রসূতির অল্পকারণে অসন্তুষ্ট হওয়া, অথবা সর্ব্বদা রাগ করা উচিত নয়। উহাতে স্তনের দুগ্ধ অল্প হইয়া যায়। তা' ছাড়া অনবরত শোক, দুঃখ, চিন্তা বা অন্য কোনপ্রকার মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাইলেও প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা ঘটিয়া থাকে। এজন্য সন্তানের জননীকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করা উচিত এবং সন্তানের প্রতি যাহাতে দিন দিন স্নেহ-মমতার বৃদ্ধি হয়—এরূপ ভাবে সন্তানের লালনপালন করা কর্ত্তব্য। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহমমতার অভাব হইলেও স্তনদুগ্ধ অল্প হইয়া যায়।

আজকাল প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা বা অভাব ঘটিলে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান বা প্রতীকারের কোনপ্রকার ব্যবস্থা না করিয়াই শিশুর জন্য গরু, ছাগল বা গাধার দুগ্ধের অথবা বিলাতী টিনের দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল অবৈধ অতুষ্টিকর ব্যবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি বা স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়া থাকে কি না সে বিষয়ে কেহ লক্ষ্য করেন না। এই যে শৈশবাস্থায় যকৃতের অতিবৃদ্ধি ও জ্বর প্রভৃতি অভিনব রোগ-সকলের উৎপত্তি হইতেছে, সে সকল যে শিশুখাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য নহে—ইহা কি কেহ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যেখানে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিমতা যত অধিক,

সেখানে রোগেরও তত বাড়াবাড়ি। পল্লীগ্রামে শিশুর অকালমৃত্যু সহরের অপেক্ষা অনেক কম। সেখানে অর্থের অভাবেই হউক, অভিজ্ঞতার অভাবেই হউক, কৃত্রিম খাদ্যের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না। প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, কি প্রকারে স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে, এই চিন্তাই গৃহস্থগণের মধ্যে জাগিয়া থাকে। তখন তাহারা বিলাতী টিনের দুগ্ধের জন্য ব্যস্ত না হইয়া স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের সে চেষ্টা প্রায়ই ফলবতী হইয়া থাকে, শিশুগণ আকণ্ঠ মাতৃস্তন্য পান করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ করিতে থাকে। চেষ্টার দ্বারা একান্ত যখন স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না, তখনই তাহারা গোদুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

১। স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে হইলে,—বনকাপাস ও আকের মূল,—প্রত্যেকটী চারি আনা পরিমাণে বাঁটিয়া কাঁজির সহিত গুলিয়া প্রসূতিকে প্রত্যহ একবার অথবা দুইবার খাইতে দিবে। অথবা—

২। ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ আধতোলা মদ্যের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ একবার খাওয়াইবে। অথবা—

৩। শালিতণ্ডুল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। কিংবা—

৪। প্রসূতিকে প্রত্যহ কিছু অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই প্রসূতির স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৫। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু—ইহাদের প্রত্যেটী ছয় আন পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে যে কেবল স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে এমন নয়, ঐ দুগ্ধ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে। অথবা—

৬। বচ, মুথা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল—ইহাদের প্রত্যেকটী সওয়া চারিআনা পরিমাণে লইয়া পূর্ব্ববৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করাইবে। ইহা দ্বারাও নির্দ্দোষ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৭। বেণার মূল, শালিধান্য, আকের কোঁরা, উলুখড়ের মূল, কাশের মূল, গুলঞ্চ, ইক্ড়া ও গন্ধতৃণ,—ইহাদের প্রত্যেকটী দুইআনা পরিমাণ,—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাও নির্দ্দোষ স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধির একটি মহৌষধ।

৮। এতদ্ভিন্ন যবের পালো, যব, গমের ময়দার রুটী, শালি বা যষ্টিক চাউলের অন্ন, মাংসরস, সুরা, রসুন, মৎস্য, লাউ, কলমীশাক, কেশুর, পানিফল, মৃণাল প্রভৃতি ভোজন করিলে অথবা—

৯। ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ বা যষ্টিমধু চূর্ণ কিম্বা শতমূলীর রস অথবা শতমূলী চূর্ণ দুগ্ধের

সহিত পান করিলেও স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিশুর স্নান।

যতদিন শিশুর নাভি শুকাইয়া না পড়িয়া যায়, ততদিন তাহাকে তৈল মাখাইয়া একটু গরম জলে 'গামছা' দিয়া গা মুছাইয়া দিবে। তা'র পর নাভি পড়িয়া গেলে ও নাভির ঘা শুকাইয়া গেলে প্রত্যহ একটু গরম জল দিয়া শিশুকে স্নান করাইয়া দিবে। কিন্তু স্নানটা ফাঁকা বা খোলা জায়গায় না করাইয়া ঘরের মধ্যে করানই ভাল। তাহাতে কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবার ভয় থাকে না। স্নান প্রত্যহ অভ্যাস করান ভাল। স্নানের পর বেশ করিয়া গা মুছাইয়া দিবে এবং বগল ও কুঁচকী প্রভৃতি স্থানে যাহাতে জল না থাকে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। স্নানের পর একটা পাত্‌লা জামা গায়ে জড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

শিশুর প্রতি যত্ন।

শিশুকে কোলে লইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বিছানা হইতে শিশুকে কোলে লইতে হইলে কদাচ হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবে না। ঘাড় ও মাথার বীটে একটা হাত, আর একটা হাত পাছা ও পায়ের নীচে দিয়া ধীরে ধীরে শিশুটাকে তুলিয়া কোলে লইবে এবং এরূপ ভাবে কোলের ভিতর রাখিবে—যাহাতে তাহার কোন রকম অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। তা' ছাড়া কখনও তাহাকে তর্জ্জন করিবে না, বা ভয় দেখাইবে না।

অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের বেশী বেশী ঘুম হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাতে বালক নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতে পারে, পিপীলিকা বা মশা-মাছিতে কোনরূপ বিরক্ত করিতে না পায়, সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। শিশু ঘুমাইলে হঠাৎ তাহাকে জাগাইয়া কোলে লইবে না, যেখানে সেখানে শোয়াইয়া বা বসাইয়া রাখিবে না এবং কাহারও নিকট হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইবে না, অথবা হঠাৎ শোয়াইয়া দিবে না। বিনা প্রয়োজনে কাঁদাইবে না। অনেকেরই অভ্যাস,—শিশুকে অনর্থক কাঁদাইয়া আনন্দ অনুভব করা; সেরূপ করা কদাচ উচিত নয়। বালক যদি কোন জিনিস লইতে জেদ করে, এবং ঐ জিনিসে যদি তাহার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহা তখনই তাহাকে দিবে, নচেৎ অন্য কোন জিনিস দিয়া ভুলাইবে। বালকের মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং বালক যাহাতে উঁচু জায়গায় না উঠে বা বসে, সে বিষয়েও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। বালকের নিজের হিতাহিত জ্ঞান নাই, সেজন্য উহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে, কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা কে বলিবে?

বালকদিগকে যে সকল খেলনা দিবে, সে সকল যেন ছেলেদের মনভুলান হয়, শক্ত করে ও হালকা হয়। যে সকল খেলনার মুখ খুব সরু, সে সকল বালকদিগকে দিতে নাই; কখন কোথায় খোঁচা লাগাইতে পারে। বালক কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, খাইতে না চাহিলে অথবা কথা না শুনিলে

তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য ভূত, ও প্রেত রাক্ষস প্রভৃতির অদ্ভুত গল্প বলিয়া অথবা বিকট বীভৎস মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া বালকগণের বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না।

শিশু যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, খোলা পরিষ্কার হাওয়ায় আপনার ইচ্ছামত হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, এবং ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, বিদ্যুতের আলো, গাছের তলা, শূন্য গৃহ প্রভৃতি হইতে শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। তদ্ভিন্ন অপবিত্র স্থানে, উন্মুক্ত আকাশের তলে, বর্ষার সময় অনাবৃত দেহে ধূলিসমাকীর্ণ স্থানে, ধূমাচ্ছন্ন গৃহে ও জলসিক্ত গৃহে বালককে কদাচ রাখিবেনা।

শিশু হাঁটিতে শিখিলে, তাহাকে আপন মনে হাঁটিতে দিবে। হাঁটিবার শক্তি না হইতেই তাহাকে কখনও হাত ধরিয়া হাঁটাইয়া লইয়া বেড়াইবে না, অথবা হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, উহার হাত ধরিয়া জোড় করিয়া হাঁটাইতে চেষ্টা করিবে না এবং কখনও বালকের হাত ধরিয়া টানিয়া উচ্চে উঠাইবে না।

বাল্যকাল হইতেই শিশুকে সময় মত খাওয়া, স্নান করা, ঘুমান ও ঘুম হইতে উঠা, মলমূত্র ত্যাগ করা, প্রভৃতি অভ্যাস করান উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত যাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি কুবৃত্তি সকল না জাগিতে পারে ও সর্ব্বদা খেলা করিয়া না বেড়ায়, অন্যায় আব্দার না করে, রাগ করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া না বসিয়া থাকে,—এই সকল অনিষ্টকর বিষয় হইতে বালককে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। কোন কুঅভ্যাস ছাড়াইতে হইলে তাহাকে সদয়ভাবে ও মিষ্ট কথায় শাসন করিবে।

শিশুর রোগ-বিজ্ঞানোপায়।

যে সকল বালক কথা কহিতে পারে না, তাহাদের অসুখ হইলে, রোগের লক্ষণ সকল বিশেষ অনুধাবন করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়। বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অথবা পেট কামড়ায়, তাহা হইলে বালক সেইসকল স্থানে বারংবার হাত দেয় ও কাঁদিতে থাকে, এবং ঐ সকল স্থানে বা পেটে হাত বুলাইয়া দিলে বালক সুস্থ হয়, আর কাঁদে না। মাথার অসুখে, শিশু মাঝে মাঝে চম্‌কাইয়া উঠে ও ভয় পাওয়ার মত চীৎকার করিতে থাকে, অথবা ঘুমানর মত চোখ বুজিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মাথা তুলিতে পারে না। তলপেটে কোনপ্রকার রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করিলে শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কিছুই খাইতে চাহে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। শিশুর মলমূত্র রোধ হইলে, পেটের মধ্যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে ও কাঁদে, তদ্ভিন্ন বমি, পেটফাঁপা, পেটে শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন শিশু সমস্ত শরীরটা অসুস্থ বিবেচনা করিলে কেবলই কাঁদিতে থাকে।

বালকের চিকিৎসা।

যে সকল শিশু জননী বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের অসুখ হইলে, স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। আবশ্যক

হইলে শিশুর আরোগ্যের জন্য ধাত্রী বা জননীকেই ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হয় এবং উপবাসও দিতে হয়। যে সকল শিশু কেবল স্তনদুগ্ধে জীবিত থাকে, অতি বড় অসুখ হইলেও কদাচ তাহাদিগকে স্তন্যপান করান বন্ধ করিবে না।

যে সকল শিশু দুগ্ধান্ন অর্থাৎ দুধসাগু বা দুধ বার্লি খাইয়া থাকে, তাহাদের অসুখে, শিশু ও জননী, উভয়কেই ঔষধ খাওয়াইতে পারা যায়। যে সকল শিশু কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া অন্নাদি ভোজন করিতে অভ্যাস করিয়াছে; তাহাদের অসুখ হইলে কেবল সেই রুগ্ন শিশুকেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যেমন চিকিৎসকের উপর শিশুর চিকিৎসার ভার দিয়া জননী নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী হইয়া থাকেন, সেরূপ করা কখনই উচিত নয়। শিশুর আরোগ্যের জন্য জননীকেও রোগিণী সাজিয়া সন্তানের জন্য যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়; তাহা না করিতে পারিলে, অক্ষুন্ন সন্তান-সুখ-লাভ ভাগ্যে ঘটে না।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-স্বাস্থ্যনীতি।

[ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—•:০:•—

স্নানবিধি।

১। সুস্থ শরীরে বেলা ৯ ঘটিকার মধ্যেই স্নান করিতে হয়। দুর্ব্বল এবং পীড়িত ব্যক্তি নিজ হইতে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া স্নানের নিয়ম প্রতিপালন করিবে। অবগাহন স্নানই প্রকৃত স্নান। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত। স্রোতের জলে স্নান করিলে শরীরের ক্লেদ এবং দেহস্থিত উষ্ণ তড়িত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া শরীরে স্ফূর্ত্তি এবং তেজ বৃদ্ধি করে। আর্য্যশাস্ত্রে স্নান পাঁচ প্রকার (ক) অবগাহন (খ) গাত্রমার্জ্জন এবং মস্তক ধৌতকরণ, (গ) হাত পা ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করণ (ঘ) শুধু তৈল মর্দ্দন করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করণ (ঙ) গঙ্গা বা তুলসী জল স্পর্শ করণ। ইহার মধ্যে ১ম এবং ২য় স্নানই প্রশস্ত। বস্তুতঃ স্নানের উদ্দেশ্য শরীর পরিষ্কার রাখা আর বায়ুপিত্তের সমতা সংস্থাপন রাখা। এতদর্থে শীতল জল এবং শ্লেষ্মাধিক্যে লবণ মিশ্রিত অল্প উষ্ণ জল ব্যবহার করা ভাল। প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করিলে শরীরের মাংসপিণ্ড অর্থাৎ পেশী সূত্র অতি কোমল এবং ঢিলা হইয়া কার্য্য শক্তি কমিয়া যায়। যাহারা

তাড়াতাড়ি একটুকু জলদিয়া স্নানকার্য্য সমাধা করে, তাহারা স্নান কার্য্যে উপকারের ফল অপেক্ষা অত্যধিক অপকারই লাভ করিয়া থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রে অস্নাত ব্যক্তি অশুচি এবং দৈব বা পারত্রিক কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া কথিত। ইহার অর্থ এই যে, নানাবিধ কার্য্য দ্বারা এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শরীর ও মন উষ্ণ, বিরক্ত, চঞ্চল এবং অপরিস্কৃত থাকে। ইহাতে দৈব ও পারত্রিক কোন কার্য্যই সুন্দর ভাবে হইতে পারে না। হিন্দু স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,শ্বাস ক্রিয়া বাম নাসিকায় প্রবাহিত হইবার সময় স্নান করিলে শীতলতা জনিত অপচয় অর্থাৎ সর্দ্দি হইতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম বিচার শীল প্রাণায়ামপরায়ণ যোগিগণ এই বাক্যের সম্পূর্ণ পরীক্ষা পাইয়া শ্বাস গতির বহুবিধ ক্রিয়া, ভঙ্গী এবং ব্যবহার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্নান বিধি সাধারণ লোকের উপযুক্ত নহে।

২। স্নান করিবার পূর্ব্বে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাথায় তৈল দিবে। ইহার পর অনামিকা দ্বারা নাভিতে তৈল লাগাইবে কিন্তু নাভিদেশ নাড়া চাড়া করিবে না। ইহার পর কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কর্ণে এবং নাসিকায় তৈল প্রদান করিবে। ইহার পর অন্যান্য অঙ্গে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিয়া তৈল লাগাইবে। বলা বাহুল্য তৈল বলিতে তিল তৈলই বুঝায়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সরিষা, নারিকেল, রেড়ি, তিসি ইত্যাদিকে তৈল সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া লইয়াছি।

এখনকার দিনের অনেক পেটেন্ট তৈল ব্যবহারে আজকাল অনেকের মস্তকের কেশ নষ্ট আর নানা রূপ চর্ম্ম রোগ ও স্নায়ু দুর্ব্বল প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞাপনের চটকে মুগ্ধ হইয়া নব্য বঙ্গ সুগন্ধ মিশ্রিত তৈল মাখিয়া বিলাসিতা বৃদ্ধির সহ অর্থ আর দেহ বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বকালের ব্যবস্থিত তিল তৈল অভাবে নারিকেল বা সরিষা তৈল মাখিলে স্বাস্থ্যেরঅপচয় আর অর্থের অপব্যয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী জাতি একমাত্র সরিষার তৈল ব্যবহার করিলেও শরীরের স্নিগ্ধতা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তৈল মাখিলে দৃষ্টি শক্তি আর চক্ষুর তেজ পূর্ণরূপে রক্ষা হইয়া থাকে। এখনো ৮০।৯০ বর্ষের বহু বৃদ্ধ বিজ্ঞাপনের তৈল ব্যবহার না করিয়া তিল, নারিকেল বা সরিষার তৈল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাখিয়া যুবক গণের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। বলা বাহুল্য, এই নিয়মে তৈল মাখিলে চক্ষু উঠা পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নাভিতে তৈল দেওয়ায় জঠরাগ্নি সতেজ ও চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা ব্যান বায়ুর গতিবিধি অর্থাৎ শরীরের নিম্ন ভাগের বায়ু প্রবাহ সরল ও সহজ রাখা যায়। নাভিমূলে সমান বায়ু(নাইট্রোজেন) থাকে। ইহাকে অধিক নাড়া চাড়া করিলে উদর ভগ্ন এবং অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে। এই জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের আদেশ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র নাভির চারি অঙ্গুল নিম্নে বা উপরে পরিধান করিবে। নাভি

বা কোন ইন্দ্রিয়াদি অধিক মর্দ্দন করিবে না।

৪। স্নান সময়ে জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে গিয়া অন্য কোন পাত্র অথবা গামছা দ্বারা মাথার উর্দ্ধ হইতে জল দিলে মাথা অধিক শীতল হয়। যাহাদের মস্তকের উপরাংশ সর্ব্বদা উষ্ণ এবং চক্ষু অধিকাংশ সময় পিচুটি যুক্ত—তাহারা চক্ষু মেলিয়া জলে ডুব দিবে। ইহাতে মস্তক শীতল এবং চক্ষুর উষ্ণতা নিবারিত হইবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে অথবা মাথা ঘুরিলে কিম্বা উর্দ্ধশ্লেষ্মা জন্য চক্ষুর কোন রোগ জন্মিলে বা শিরঃশূলাদি কোন বিকৃতি লক্ষণ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে প্রতিদিন স্নান করা উচিত। স্নান করিতে গিয়া প্রথমে এক অঞ্জলি জল মাথায় দিবে। পরে ডুব দিয়া মুখে যত জল ধরে—তত জল নিয়া চক্ষু চাহিয়া অন্ততঃ ৫।৬টি ডুব দিবে। ইহার পর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। দেহে অধিক জল শোষণ করিবে না।

৫। অপরের পরিধেয় অথবা গামছা ব্যবহার করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে একের ছোঁয়াচে ব্যাধি অপরের শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে।

বিগত শ্রাবণ মাসে আমি মতিহারীতে এইরূপে বিপদস্থ হইয়াছিলাম। সঙ্গে গামছা ছিলনা, তাই একটি পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট গামছা চাহিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে রাত্রিতেই চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, পণ্ডিত মহাশয় ইতিপুর্ব্বে 'চক্ষুউঠা' পীড়ায় ভুগিয়াছিলেন। তিনি রোগমুক্ত হইয়া গামছা পরিষ্কৃত করিলেও উহা হইতে চক্ষুউঠা পীড়ার বিষ পরিত্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে দদ্রু, পীড়াকে স্বল্পকুষ্ঠ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। দদ্রু পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির বস্ত্র পরিয়া আমারএক পরিচিত ব্যক্তি উৎকট "মহিষা দাদ" রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ পীড়ায় তাহাকে "ক্র্যাইসোফ্যানিক্ সালসার এমেটিক এসিড" প্রভৃতি ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য করিতে পারি নাই শেষে গোমূত্র আর তুলসী পত্র এবং লিভারপুলি লবণ প্রত্যহ খাওয়াইয়া আর মাখাইয়া অনেক আরোগ্য করিয়াছি।

৬। স্নান কালে অল্প সাঁতার কাটা মন্দ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বাজী রাখিয়া সাঁতার কাটা অতীব অন্যায়। কেননা ইহাতে প্রধানতঃ শ্বাস গতি দীর্ঘ হয়, দ্বিতীয়তঃ ফুসফুসে রক্তাধিক্য জন্মে, তৃতীয়তঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়া অধিক হইয়া পরিশেষে "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম" হইয়া সন্ন্যাস প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে।

৭। স্নান সময়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে চর্ম্ম পরিষ্কার হয় এবং বর্ণ সংস্কার আর মাংসপেশী সতেজ হয়। যাঁহারা তৈল মাখিয়া থাকেন তাঁহাদের তো গামছায় অঙ্গ মুছা নিতান্ত আবশ্যক—তৈল ধুইয়া ফেলিলে বস্ত্র পরিস্কার আর চর্ম্ম মসৃণ হয়। আর যাঁহারা তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষেও একটুকু জোরে অঙ্গ মার্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক। সাবানের চুণ বা পটাস অংশ লোমকুপে আবদ্ধ থাকিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রত্যেক লোমকুপ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছিদ্র না থাকিলে শরীরের ক্লেদ ঘর্ম্ম

সহ বাহির হইতে পারে না, প্রত্যুতঃ উহাতে চূর্ণ কিম্বা পটাস ভাগ লাগিয়া থাকিলে ক্ষত এবং একজিমা নামক উৎকট চর্ম্মপীড়া হইবার অতি সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য প্রথার সাবান ব্যবহার অপেক্ষা ভারতের সরিষা তৈল ব্যবহার শরীর রক্ষার পক্ষে শতগুণে উৎকৃষ্ট। অবশ্য সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপ ধৌত করা চাই।

৮। স্নান কালে অন্যমনস্ক হইয়া বা গল্প করিতে করিতে কিম্বা হাস্য, ক্রন্দন এবং সঙ্গীত করিতে করিতে স্নান কার্য্য নিষিদ্ধ। ইহাতে শরীর মন উভয়েরই অনিষ্ট হয়। অন্যমনস্ক স্নানার্থি জলে ডুবিয়া কিম্বা জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্তও হইতে পারে।

৯। স্নানকালে একগলা জলে দাঁড়াইয়া ৭ বার মুখে জল লইলে বায়ুর ঊর্দ্ধগতি নিবারিত হয়।

১০। প্রাতঃস্নানে শরীর রুক্ষ হয়। সন্ধ্যাস্নানে শ্লেষ্মা জন্মে, বেলা ৯টা ১০টায় স্নানই প্রশস্ত কাল।

১১। শীতকালে এবং বর্ষাকালে প্রত্যহ স্নান না করিলে তত হানি নাই। আবার অল্প জলে ভিজিয়া শরীর ঠাণ্ডা হওয়া অপেক্ষা অবগাহন স্নান করিয়া পদদ্বয় শুষ্ক করতঃ গরম সরিষার তৈল পায়ের তালুতে মাখিলে এক দিনেই সর্দ্দি আরোগ্য হয়। অতি বৃদ্ধ, অতি শিশু এবং সদ্যঃ প্রসূতা নারী এবং পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যহ স্নান করিবেনা। পক্ষান্তরে পরিশ্রমী, কেরাণী, উকিল,মোক্তার লেখক,চিত্রকর, প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষে স্নানের সময় পরিবর্ত্তন কখনই কর্ত্তব্য নহে।

শয়ন ও নিদ্রা।

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শয্যা ব্যবহার করিবে। উপাধান অর্থাৎ বালিস যেন অধিক উচ্চ, অধিক নীচু এবং কঠিন না হয়। কিন্তু অতি কোমল বালিশও ভাল নয়। বালিশ হীন শয়নে রক্ত গতি পরিচালনের বহু বিঘ্ন জন্মে। ইহার ফলে প্রায়ই মস্তিষ্ক পীড়া আর ফুসফুস জনিত বহু রোগ উপস্থিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—হিন্দুস্থানের সাধারণ গৃহস্থগণের অধিকাংশই মাথার পীড়া, কর্ণের পীড়া এবং শ্লেষ্মা ঘটিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ইহারা একে কঠিন কর্ম্মী, তাহার উপর বালিশ ব্যবহার ইহারা প্রায়ই করেনা, হয় এক খানা বস্ত্র পাতিয়া খাটিয়ার ডাঁসায় মাথা রাখিয়া না হয় হাতের উপর মাথা দিয়া মাটিতে শয়ন করে। আমি দীর্ঘ ১৫।১৬ বর্ষ হিন্দু স্থানের বহু প্রদেশে থাকিয়া ডাক্তারি করিয়াছি, এই সকল স্থানে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা মাথার ব্যাধি, কর্ণের রোগ আর দুর্ব্বল ফুসফুস প্রবণ রোগী বহু পাওয়া যায়। অতি বড়লোক ভিন্ন—"গ্যারদা" (বালিশ) সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে। বাঙ্গালা দেশের মজুরেরাও বিনা বালিশে শয়ন করে না। বালিশ প্রস্তত করিতে কিন্তু কার্পাস তুলা ভাল নহে। শিমুল তুলা আর আটার ভুষিচিনার (একপ্রকার শস্য) বালিশই প্রশস্ত। আকন্দ তুলা নির্ম্মিত উপাধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দুই ব্যক্তির পক্ষে এক বালিশে শয়ন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ইহাতে একের নিঃশ্বাস অপরের টানিয়া লওয়ায় উভয়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। বঙ্গসমাজে পতি-পত্নী একই বালিশে শয়ন করিয়া

করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ঠিক নহে। এক সময়ে এই কারণে স্ত্রীর গুপ্ত নাসিকার ব্যাধি স্বামীর—হইয়াছিল ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুতঃ এক উপাধানে দুই জনের শয়ন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

২। শয়নের পূর্ব্বে পাদদ্বয় ষিক্ত করা অনুচিত। আবার কোন কোন ঋষি শয়নকালে গামছা দ্বারা উভয় পদ মুছিয়া—শুইতে বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থা অসঙ্গত নহে, কারণ পা ধুইয়া এবং মুছিয়া শয়ন করিলে সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হইয়া সুনিদ্রা হয়। যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক দুর্ব্বল, তাহারা শয়নকালে পায়ে একটু তৈল মাখিয়া শয়ন করিলে যথেষ্ট সুস্থতা অনুভব করিতে পারেন।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে মাথা রাখিয়া শয়নই প্রশস্ত। কখনো উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না—কারণ এই দিকে চুম্বকের আকর্ষণ অধিক। রক্তে লৌহের ভাগ অধিক আছে বলিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিলে অনেক প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। এই তত্ত্বের মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুরাণে একটী চমৎকার গল্প বর্ণিত আছে, যথা—পার্ব্বতীর পুত্র গণেশ উত্তর শিয়রে শয়ন করিয়াছিল বলিয়া শনির দৃষ্টিতে তাহার মাথা উড়িয়া যায়। তাহার পর উত্তরশিয়রী ঐরাবতের মাথা আনিয়া উহাতে সংযোগ করা হয় বলিয়া গণেশ গজমুণ্ড হইয়া যান। যাহা হউক সর্ব্বদা পূর্ব্ব শিয়রে শয়ন করিবে। দক্ষিণে যমের অধিকার, এদিকেও মস্তক রাখিবেনা। স্বাস্থ্যতত্ত্বের এই নিয়ম প্রতিপালন জন্য ধর্ম্মমূলক এতগুলি উপদেশ আছে। কৌশলী হিন্দুস্বাস্থ্যবিদগণ ধর্ম্মের সহিত শরীর রক্ষার নিয়মগুলি পালন করাইবার জন্য পৌরাণিক গ্রন্থনিচয়ে এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় বাহিরের শীতল বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিবে না। করিলে সাধারণতঃ সর্দ্দি, হাঁচি, কাশী এবং বাতব্যাধি জন্মিতে পারে। কারণ শ্বাস গতিই জীবনযন্ত্রের মূলকেন্দ্র।

৫। নিদ্রা যাইবার সময় বালিশ বা হস্তাদির চাপ যেন বুকে না লাগে—এরূপ ভাবে সতর্ক হইয়া শয়ন করিবে। ফলকথা এই যে, ফুসফুসের কার্য্য যেন নিয়মিতভাবে চলিতে পারে। আবার নাসিকা আবৃত করিয়া শয়ন করিতে নাই। যাহাতে নিদ্রিতাবস্থায় পরিস্কৃত বায়ু নাসিকা-সাহায্যে গ্রহণ করা যায়—তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পরের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস যেন নাসিকা পথে কদাচ না যায়।

৬। প্রত্যহ নিদ্রা, শয়ন, আহার ও স্নানের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির রাখা সুসঙ্গত। রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটায় নিদ্রা যাওয়া উচিত।

৭। রাত্রিতে শয়ন করিবার কিছু পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করা পরম উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর। দুগ্ধের অভাবে শীতল জল পান করাও চলিতে পারে। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের সমস্ত যন্ত্রের বিশেষতঃ স্নায়ু কেন্দ্রের কার্য্য সামান্য ভাবে পরিচালিত হয়। এই জন্য উহার বলবৃদ্ধিকল্পে দুগ্ধ—অভাবে জলপান করিবার বিধি। পাকস্থলী খাদ্যে পূর্ণ

থাকিলে অন্ততঃ অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধ খাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

৮। শয়ন জন্য মৃত্তিকায় শয্যা পাতিয়া শয়নই প্রশস্ত, তবে দেশকাল-পাত্রভেদে অবস্থা ভিন্নরূপ হয়। খাট্-পালঙ্ক-খাটিয়া প্রভৃতিতে শয়ন করিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে শয়ন করিয়া যাহাতে ভূমিতল স্পর্শ করা যায়—এরূপ ভাবে উহা নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

৯। রাত্রিতে আহারান্তে আচমন করিয়া মুখ জলপূর্ণ করতঃ প্রস্রাব অন্তে ধর্ম্ম-মূলক সদগ্রন্থ অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পড়িয়া বা বন্ধুসহ মিষ্ট আলাপ করিয়া আবার প্রস্রাব হইলে শয়ন করিবে। আহারান্তে নিয়মিত জলপান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কৃত হয়। ইহাতে সুনিদ্রা এবং পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

১০। শয়নকালে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিতে হয়। তবে ঋতুভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে হানি নাই। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত ও বসন্তে শরীরের উত্তাপ সহজে বাহির হইতে পারে। এজন্য সূক্ষ্ম চাদর ব্যবহার করিতে হয়। অত্যধিক গরমে মশারী ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। শীত ঋতুতে লেপ-কম্বলই যথেষ্ট। শয়নকালে অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহার অর্থ সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা মনের প্রফুল্লতা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু-বৈজ্ঞানিকেরা চন্দনাদির এই ভাবে ব্যবহার কেবল মাত্র শীত এবং বসন্ত ঋতুতেই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক দুর্গন্ধময় স্থানে নিদ্রা যাইবে না ইহা আমরা আর্য্যঋষির কথায় স্থির করিয়া লইলাম। শয়ন গৃহে, বিড়াল, কুকুর, ভেক—চামচিকা, গো, অশ্ব, কপোত ইত্যাদি তির্য্যক প্রাণী (পক্ষী জাতি) মুক্ত বা আবদ্ধ অবস্থায় কখনো রাখিবে না। যেহেতু ইহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা আছে। আবার উহাদের জন্য অন্যরূপ হিংস্র জীব গৃহে উপস্থিত হইতে পারে।

ইউরোপীয় জাতি কুকুর লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এ অবস্থা আর্য্য ঋষির উপদেশ বহির্ভূত। আর্য্য ঋষি এইরূপ নিকৃষ্ট জীব গৃহে থাকায় সর্পাদি জীবের দ্বারা মানুষের অনিষ্ট হইতে পারে। বিবেচনা করিয়াই এরূপ কার্য্য করিতে নাই বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়া এক সময় আমারই এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার শয়ন গৃহের জানালার পার্শ্বে একটী হংস ডিম 'তা' দিতেছিল। সহসা সর্প আসিয়া আমার নিকটস্থ দুইটি শিশুর শয্যায় উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে কার্ব্বলিক এসিড সাহায্যে সর্প তাড়াইয়া বিপদ মুক্ত হই। নিকৃষ্ট জীব শয়ন গৃহে থাকিলে কুষ্ঠ-যক্ষ্মাদি পীড়াক্রান্ত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১১। রন্ধন গৃহে শয়ন করিতে নাই। কেননা তথায় কার্ব্বনের অংশ অধিক থাকিতে পারে। কার্ব্বনিক বায়ু নর শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। নাসিকাগ্র হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন হস্ত পরিমিত স্থান শয্যার চারিদিকে মুক্ত রাখা উচিত। মোটের

উপর কথা এই যে, শয়ন গৃহে অধিক দ্রব্যাদি রাখিতে নাই, কেননা নিদ্রাকালে প্রশ্বাসের গতি ৭২ অঙ্গুলি স্থান বিস্তৃত হয়। বাক্স, ডেকস্, তোরঙ্গ এবং তৈজসাদি বেশী করিয়া রাখিলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ হইতে পারে। ইহাতে দেহে তাপাধিক্য হইলে প্রাণবাহী শুক্র তরল হইয়া জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাবে নির্গত হইয়া যায়।

১২। অধিক রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় কেহ ডাকিলে সহসা উত্তর দেওয়া উচিত নহে। ভালরূপ জানিয়া শুনিয়া তবে গৃহ হইতে বাহির হইতে হয়।

১৩। সুস্থ শরীরে দ্বাদশ দণ্ডের অধিক নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। সাড়ে সাত দণ্ডে ১ প্রহর হয়। সুতরাং ১২ দণ্ডে প্রায় দুই প্রহর। ১২ ঘণ্টা নিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট সময়। রাত্রি ১০টায় নিদ্রা গিয়া অতি প্রত্যূষে উঠিলে নিদ্রার সময় এবং বিশ্রাম যথেষ্ট হয়। ইহার অধিক সময় নিদ্রা যাওয়া আর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত শয্যায় থাকা দেহ নষ্টের মূল।

১৪। রাত্রি-জাগরণ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। যে কোন কারণেই হউক আদৌ রাত্রি জাগরণ করিবে না। জীব নিদ্রিতাবস্থায় জীবনীশক্তি—মহাশক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মহা কার্য্যের বিঘ্ন হইলে অল্পায়ু হইতে হয়। বিলাসিতা আর থিয়েটার বা যাত্রা শুনিয়া যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা অধিকাংশই রুগ্ন ও অল্পায়ু। বিশেষতঃ কোন কারণে যদি রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তবে প্রাতে উঠিয়াই স্নান করা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৫। শয়ন গৃহে প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় ধুপ ধুনা দেওয়া উচিত। ধুনায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) প্রবাহিত হয়। হিন্দু দার্শনিকগণ ধুনা আর গোময়কে ফেনাইল প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। যেস্থানে কার্ব্বনিক গ্যাস উৎপত্তির কথা, সেই স্থানেই গোময় ও ধুনার ধুম দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গোময় আর পূজার ধুনা এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৬। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু এই সময় সমীরণ "নামে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুই জীবের নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং জীবকে আরোগ্য পথে উপস্থিত করে। আবার এই বায়ুর গতিই চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষাকারী। এইজন্য ঋষিগণ এবং গুণ-কর্ম্মশালী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে ভগবদারাধনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সময়েকে "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" কহে। ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্তে উঠিয়া- প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর বায়ু সেবন উদ্দেশ্যে মুক্ত স্থানে, উদ্যানে, নদীতীরে, রাজপথে ভ্রমণ করিয়া—পবিত্র আসনে বসিয়া অভ্যাস এবং প্রবৃত্তিমূলক ইষ্টনাম স্মরণ ও পূজন করিবে। পরে পুষ্টি-কারক অল্প খাদ্য খাইয়া তবে সংসার কার্য্যে মন দিবে।

১৭। নিদ্রা হইতে উঠিয়া সহসা অনাবৃত দেহে বাহিরের বায়ু শরীরে লাগাইবে না। খালিপায়ে পায়খানায় যাইবে। এই সময় কিন্তু গাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করা উচিত। কারণ বিষ্ঠাদির দূষিত বায়ু শরীরে লাগিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা

আছে। নিদ্রাকালে শরীর উষ্ণ হয়। এই উষ্ণাবস্থায় শীতল বায়ু সহসা শরীরে লাগিলে শ্লেষ্মাব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তাহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধিও হইতে পারে।

১৮। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই কথা বলিবে না, শৌচ কার্য্য করিয়া তবে কথা বলিবে। বহুভাষী ব্যক্তি বহু রোগের আধার। স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

১৯। দিবানিদ্রা আয়ুক্ষয়কর। কেবল গ্রহণী, অজীর্ণ এবং বায়ু পীড়িত লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। আর্য্যশাস্ত্রে উপবীত হইবার সময় একটী বৈদিকসূক্ত পড়িতে হয়। উহার একস্থলে আছে, "মাদিবা সাপ্সি"। এই মন্ত্রের উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা সকলের উচিত।

২০। শয়ন গৃহে আলো জালিয়া নিদ্রা যাইবেনা। কারণ অগ্নি হইতে যে অঙ্গারক বায়ু (কার্ব্বনিক গ্যাস) উৎপন্ন হয়, উহাতে গৃহস্থিত প্রাণ বায়ু (অকসিজন বা অম্লজান) জ্বলিয়া সমস্ত গৃহকে এবং শায়িত ব্যক্তিকে বিপন্ন করে।

২১। রাত্রিতে মশারী ব্যবহার করায় দোষ, গুণ—দুই-ই আছে। যে স্থানে মশকাদি জীবের অধিক অত্যাচার, তথায় বাধ্য হইয়া মশারি ব্যবহার করিবে। আবার অল্প মশা আছে—অথচ সেই প্রদেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ—তথায় মশারীই একমাত্র শরীর রক্ষার উপায়। কিন্তু যে স্থানে মশা নাই, ম্যালেরিয়াও নাই—তথায় মশারী ব্যবস্থা ঠিক নহে। এই সমস্ত স্থানে মাত্র বর্ষা ঋতুতে মশারী ব্যবহার করিলে হানি নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা জীবনেও মশারী ব্যবহার করেন নাই। মোটের উপর মশারী ব্যবহার অনুচিত নহে।

অতঃপর প্রাত্যহিক বিহার এবং আহার আদি বিষয়ে লিখিত হইতেছে।

প্রাতরুত্থান ও শৌচ ক্রিয়া।

পূর্ব্ব গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশিত হইবা-মাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর্য্য শাস্ত্রে এই সময়কে "ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সাধারণ বায়ু যে পাঁচভাগে বিভক্ত,তাহার প্রধান ভাগের নাম "সমীরণ", ইহা এই সময় প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর অপর নাম প্রাণবায়ু। জীবের জীবনী শক্তি রক্ষা করিতে আর স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এই বায়ুই সর্ব্ব প্রধান। রাত্রির নিদ্রা জনিত ক্লান্তি এই বায়ুদ্বারা নষ্ট হয়। এইজন্য ঋষিগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যগণ এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন করিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

১। কখনো মল মূত্রের বেগ ধারণ করিবে না—কেননা উহাতে উদরাগ্নি কুপিত হইয়া দেহের সমস্ত শ্লেষ্মাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বক্ষ গহ্বরে প্রবেশ করে, উহাতে পেট এত গরম হয় যে শুক্রকে তরল করিয়া যক্ষ্ম পীড়া পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারে। আবার আবদ্ধ মলরাশি "এলিমেণ্টরী কেনাল" নামক উদরের স্থান বিশেষে গমন করিয়া একরূপ উৎকট পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কখনো বা অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করতঃ

মুখ দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শরীরে অশান্তি এবং ক্ষুধাহীনতা, মাথাধরা, মূত্ররোধ, জ্বর, বমি প্রভৃতি হইয়া থাকে। একটী কেরাণী সাহেবকে ক্যাস বুঝাইতে বসিয়া দুইবার প্রস্রাবের বেগ সামলাইয়া "লেজার-বুক" দেখানার সময় শরীর উষ্ণ হইয়া সহসা টেবিলের উপর পড়িয়া যান। তাহার পর ডাক্তার ডাকিন গিয়া কারণ অনুসন্ধানে ক্যাথিটার যোগে ৩ পাউণ্ড প্রস্রাব বাহির করেন—কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক পরে কেরাণীর ইহ লীলা সমাপ্ত হয়।

২। অনাবৃত দেহে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দেহ আবৃত না থাকিলে মলমূত্র ত্যাগের স্থান হইতে দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়। উহা গাত্রে লাগিলে চর্ম্ম-পীড়া—এমন কি কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঐ সময় দেহে শীতল বাতাস লাগিলে মল-মূত্র সুন্দর রূপে হয় না। এই সময় দন্তে দন্তে সজোরে চাপিয়া কার্য্য করিলে দন্ত পীড়া জন্মিতে পারে না। তৈল মাখিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিও না। কেন যে এই বিধি তাহার কোন বিশেষ হেতু আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। মাত্র চিন্তা শক্তিদ্বারা ইহাই জানিয়াছি যে, সজোরে মলবেগ ও প্রস্রাব বেগ দিবার সময় শরীরের অপান বায়ুর যে নিক্রমণ হয়, উহা তৈল দ্বারা আবদ্ধ লোম কূপের মধ্য দিয়া সহজে আসিতে বাধা পায়। দেখিয়াছি বহু প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ স্নান সময়ে তৈল মাখিয়াই পায়খানায় গিয়া থাকেন। ইঁহাদের কখনো চর্ম্মপীড়া বা চুলকানি পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহারা বলেন তৈল মাখিয়া পায়খানায় গেলে বরং ব্যান-বায়ুর ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যাহা হউক আমাদের মতে শাস্ত্রউপদেশ মান্য করিয়া চলাই সুসঙ্গত।

৩। শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া—স্বাস্থ্য-তত্ত্বের অনেক কথাই ঋষিপ্রণীত স্বাস্থ্য-তত্ত্বে আছে। নাসিকার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ লইয়া শরীর রক্ষার অনেক কথা শাস্ত্রে লিখিত। আমরা যোগী নহি বা প্রাণায়াম পরায়ণ নহি। এই তত্ত্বের সুক্ষ্ম ক্রিয়া বুঝিতে অক্ষম। তথাপি শরীর রক্ষা ব্যপদেশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া দুই চারিটি কথার যাহা আলোচনা করিলাম ইহা অতি সাধারণ। ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি মর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস প্রবাহকালে মলত্যাগ আর বাম নাসিকার প্রবাহকালে মূত্র ত্যাগ করিবে।

৪। মলভাণ্ড পরিষ্কার রাখা পরমায় বৃদ্ধির একটি প্রধান ক্রিয়া – এইজন্য যোগিগণ প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা—আর বৈদ্যগণ ভেষজ ক্রিয়া দ্বারা উদর পরিষ্কার অর্থাৎ কোষ্টশুদ্ধি করিতেন। মল মূত্র, নিষ্ঠিবন বা থুঁথু, শুক্র, রজঃ, ঘর্ম্ম, কফ, পিত্ত এই আটটার নাম মল। ইহা জীবশরীর হইতে সর্ব্বদা পরিত্যক্ত হয়। ইহার একটীর বিকৃতি ঘটিলে দেহ রোগ-প্রবণ হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্নাদির পরিপাকাবশিষ্ট বস্তুই মল বা বিষ্ঠা—পানীয় বস্তুর পরিপাকাবশিষ্ট জলীয়াংশের নাম মূত্র। খাদ্য পরিপাকের পাঁচ প্রকারে রসের মূল রসটির নাম নিষ্ঠিবন বা থুঁথু। মেদধাতুর অসার অংশের নাম ঘর্ম্ম। শুক্রের অসার অংশ কফ আর রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা হইতে

উৎপন্ন অষ্ট ধাতুময় পরিশুদ্ধ প্রধান রসের নাম শুক্র। রক্তের অসার অংশ পিত্ত। আট প্রকার ধাতুময় শোণিত জাত অংশের নাম আর্ত্তব বা রজঃ। এই আট প্রকার মলকে প্রাণ, অপান (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বা অম্লজান উদজান) স্বশক্তিতে দেহরক্ষাকারী অংশ রাখিয়া অতিরিক্ত ভাগকে স্রাবন গ্রন্থিদ্বারা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সকল মনের চালক, পালক, ধ্বংস ও প্রস্তুতকারক মহাবস্তুই প্রাণবায়ু বা অক্সিজেন। সুতরাং প্রাণবায়ুর সাম্যভাব রক্ষা করাই স্বাস্থ্যরক্ষা নামে অভিহিত। সুতরাং মলমূত্রের বেগ ধারণ আর অন্যবিধ অনিয়ম করাই স্বাস্থ্য-হীনতার প্রধান কারণ।

৫। মলত্যাগকালে মাটি খুঁড়িয়া তাহার পর মাটি চাপা দেওয়া অভিজ্ঞ জীবহিতকারী ব্যক্তির পক্ষে অতি সুনিয়ম। ভগবান এই নিয়মটিকে জীব বিশেষ দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মলের উপর জলধৌত না করিয়া ধুলা বা ভস্মাচ্ছাদিত রাখা সঙ্গত। কেননা মলমূত্র ত্যাগে যে দূষিত গ্যাস উৎপন্ন হয়, উহাতে সাধারণ ভূ-বায়ু দূষিত হইয়া নিজের ও পরের অনিষ্ট করিতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী সর্ব্বজীবে দয়াশীল ঋষিগণ এইজন্যই এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, তিনবার হাতে তালি দিয়া গ্রীবা হেলাইয়া আকাশ দৃষ্টিতে মলত্যাগ করিতেও ঋষি পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে শব্দ হইতে হিংস্র জীবের আশঙ্কা এবং বায়ুর গতি প্রবর্ত্তনের সুবিধা হয়।

৬। মলত্যাগের বেগ হউক, আর না হউক প্রত্যহ দুইবেলা পায়খানায় গিয়া অন্ততঃ জলদ্বারা মলদ্বার ধৌত করা আবশ্যক। প্রবাদ আছে যে, "হয় না হয় দুইবার যায়, তার কড়ি না বৈদ্যে পায়।" দুইবার দাস্ত হউক আর না হউক সামান্য বায়ু নিঃসরণ হইলেও উপকার আছে। এই স্থানে তন্ত্র শাস্ত্রের একটী আদেশ প্রতিপালন করিলে অর্শ, ভগন্দর, গুহ্য কণ্ডূয়ন প্রভৃতি নিবারিত হয়। তন্ত্রকার ঋষি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে অন্ততঃ বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলী তৈলষিক্ত করিয়া ২।৩ বার মলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলাশয়ে ধৌত করে, তাহার জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত থাকে এবং সে উপরোক্ত ব্যাধিগুলিতে আক্রান্ত হইতে পারে না, এই ব্যবস্থা দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তাহা নিরাময় হয়। আবার এই সময় থুথু ফেলিবে না—কেননা থুথুই গুপ্ত শুক্রের রূপান্তর বস্তু।

মলত্যাগ হইলে "হাতে মাটি" দেওয়া স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উৎকৃষ্ট নিয়ম। অন্ততঃ তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা বাম হস্ত ধৌত করিবে। এই কার্য্যটি দ্বারা দুইটি মহাকার্য্য সম্পন্ন হয়। দুর্গন্ধ দূরীকরণ আর হস্ত তলের লোমকূপ দ্বারা দূষিত বস্তুর—প্রবেশ নিবারণ। বহুল নব্য ব্যক্তি জলদ্বারা হাত ধুইয়া চলিয়া আসেন, —মাটি ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যাঁহাদের অনুকরণে এইরূপ কার্য্য শিক্ষা, তাহারা সাবান ব্যবহার না করিয়া "কমট্" বা পায়খানা পরিত্যাগ করেন না। হিন্দুর নিকট প্রস্রাব অন্তে জল না লওয়া আর হাতে মাটি না করা—অতীব ঘৃণাজনক, আবার তাই বলিয়া বহু "শুচিবাই"

গ্রন্থ ব্যক্তির ন্যায় কেবলই বাহু পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন আর ধৌত করণ গোঁড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোটের উপর কথা এই যে, হস্তে মাটি দেওয়া, প্রস্রাব করিয়া জল গ্রহণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের নিয়ম।

৮। শীতল জলের অভাবে বা সময় গুণে উষ্ণ জলে মুখ ধুইবার নিয়ম আছে। এই সময় দন্ত পরিষ্কার আর জিহ্বা আচড়ান অতি উৎকৃষ্ট। যাহাদের দন্ত অপরিষ্কার এবং জিহ্বা ক্লেদপূর্ণ—অজীর্ণ ব্যাধি তাহাদের চিরসঙ্গিনী। দন্ত পরিষ্কার করিতে পুর্ব্বাপর ভারতবর্ষে এঁঠেল মাটি, অঙ্গার চূর্ণ আর খড়িমাটি চলিয়া আসিতেছে। দাঁতন করিবার জন্য আইসসেওড়া, নিম, ভেরেণ্ডা, বকুল, আম, অশ্বথ, যজ্ঞডম্বুর, বেল প্রভৃতির শাখা ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ কসযুক্ত তিক্ত অথবা পবিত্র বৃক্ষ শাখাই এরূপ কার্য্যে প্রশস্ত। খুলনা-যশোহর প্রভৃতি জেলায় দাঁত মাজিবার জন্য একরূপ নাতিহ্রস্ব নাতি দীর্ঘ বনজ উদ্ভিদ আছে। উহার নামই "দাঁতনগাছ"। উহাকে আবার আঁসবেলও কহে। ইহার পাতা ছোট আকারের এবং ইহা ক্ষুদ্র ফলযুক্ত হয়। যাহা হউক প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার আর জিব আঁচড়ান স্বাস্থ্য-তত্ত্বের একান্ত পালনীয় বিধি। কিন্তু তাই বলিয়া শক্ত জিনিস চিবান বা অতি জোরে দাঁতন করিবেনা। যেহেতু দন্ত শিরা অতি কোমল এবং ক্ষুদ্র। উহা হইতে রক্তপাত হইলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। একরূপ দন্ত শিশু দিগের আছে উহাকে "পানছে দাঁত" কহে। এইরূপ দন্ত হইতে সহজে রক্তপাত হয়। নিয়মিত দাঁত না মাজিলে দন্ত হইতে পাথুরি নামক দন্তাংশ পতিত হয়। উহাতে জিহ্বার অসুখ, স্নায়ুশূল এবং আরও নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়। আহারান্তে "খ'ড়কে খাওয়া" আর দাঁতন করার একাই উদ্দেশ্য। খাদ্যাংশ দন্ত ফাঁকে থাকিয়া দুগ্ধ ক্ষত প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। আবার তাই বলিয়া সর্ব্বদা বা অনাবশ্যক স্থানে দন্তে আঘাত করিতে নাই। যে সময়ই মুখ ধুইবে, সমগ্র মুখ অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু, কপাল, থুঁতু এবং কর্ণের পার্শ্ব সহ কর্ণ ধুইয়া ফেলিবে।

দিবসের দুই সন্ধি সময় অর্থাৎ প্রাতে ও সায়াহ্নে মাথা গরম বোধ হইলে অথবা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (অজীর্ণ) বোধ হইলে গ্রীবাদেশ, কর্ণদ্বয়ের চতুর্দ্দিক, মুখ মণ্ডল, ধৌত করিবে। নাসারন্ধ্র, কর্ণবিবর, চক্ষুদ্বয়, মেরুদণ্ড অঙ্গুলী দ্বারা অল্প ভাবে ধৌত করিবে। মুসলমান সমাজে ইহাকে "অজু" কহে। হিন্দুগণ ইহার সংক্ষেপ বিধিকে "মাজ্জন ও আচমন কহেন। ইসলাম ধর্ম্মগুরু মহামতি হজরত মহম্মদ এইরূপ ক্রিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে দিনে রাত্রে পাঁচবার করিতে বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা শরীরের শীতলতা হইয়া শারীরিক শক্তির উন্নতি হয়, সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে এই নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট।

শৌচ শুদ্ধি বলিয়া হিন্দু সমাজে যতগুলি বিধি ব্যবস্থা আছে, সমস্তই শরীর রক্ষা কার্য্যের প্রধান সহায়। বস্তুতঃ হিন্দু জানেন "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং"।

জঠরানল।

(ডাঃ শ্রীশরৎ কুমার দত্ত এল, এম, এস)

"ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলবান অনিল প্রাণীগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণীগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ—ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপানবায়ু, বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে—অধ্যাত্মবিদ্ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যানবায়ু মনুষ্যের শরীর-সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমানবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটী স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তর্ভাগেই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে ঐ সমুদায় শিরার দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা। উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগ প্রভাবে গুহ্য দেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্কাশয়, উর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকুর্ম্মাদি পাঁচ—এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীর মধ্যে উর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগিগণের যোগ সাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মণ! এইরূপে অগ্নি—প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীর মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। মহাভারত শান্তি পর্ব্ব, মোক্ষধামপর্ব্ব, মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন—জঠরানলকে সংক্ষুব্ধিত করে। জঠরানল সংক্ষুব্ধিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু

উদান বায়ুর প্রভাবে উর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যানপ্রভাবে কণ্ঠতাম্বাদি স্থানে অভিহিত হইয়া বেগ বশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।" মহাভারত আশ্বমেধিকপর্ব্ব, অনুগীতাপর্ব্ব, মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

আমি "আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ" ও "বায়ু, পিত্ত ও কফ" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে জঠরানল সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বলিয়াছি, সম্প্রতি আরও কয়েকটী কথা আলোচনা করিবার উদ্দেশে মহাভারত হইতে ২।১ অংশ উদ্ধৃত করিলাম। উক্ত ২টী উদ্ধৃত অংশে আমাদের শরীরে অগ্নি ও বায়ু কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে এবং বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি (Animal Heat) মস্তকে (Heat centre) উৎপত্তি হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই জঠরানল (যাহা নাভিমণ্ডলে অবস্থিত আছেন) তাহা Pituitary centre দ্বারা পরিচালিত হন এবং এই Pituitary Adreval centre দ্বারা adrenal হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা দ্বারা নিশ্বাস হইতে রক্তে oxygen শোষণ করে এবং এই cantre রই শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। আমাদের শরীরে যে কোন ব্যাধি আক্রমণ করুক না কেন, এই শক্তি সেই বিঘনাশ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, কিন্তু এই শক্তি নিজে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বাতরক্ত (Gaut) বলিয়া উল্লেখ করেন। এই জঠরানলের বিকার ঘটিলে অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় এবং এই চর্ম্ম রোগের শেষ পরিণতি বাতরক্ত ব্যারামে। এই জন্যই সমস্ত চর্ম্মরোগকে আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠরোগের পর্য্যায়ে ন্যস্ত করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে এই কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। Gout ব্যারামে এই সমস্ত প্রকার চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে।

এই সকল চর্ম্মরোগ আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সূর্য্য কিরণ দ্বারা (x rays) আরোগ্য হইতেছে। আর্য্যঋষিগণ ইহা বহুপূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যোপাসনা যে কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক—তাহা বহুস্থলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই চর্ম্মরোগ শরীরের দুর্ব্বলতা আনয়ন করে এবং সূর্য্যদেব যে দুর্ব্বলতা নাশের মূলীভূত কারণ ও অনন্ত শক্তির আধার—তাহা মহাভারতকার অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে আমি বাতরক্ত রোগের লক্ষণ সমূহ দ্বারা মহাভারতোক্ত বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিব। বাতরক্ত ব্যারামে এই জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং pituitary bod·র ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে। জঠরানল স্থানচ্যুত হইলে ইহার সহিত সমান বায়ুরও স্থানচ্যুতি ঘটে এবং শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে জ্বালা অনুভূত হয়; কারণ সমান বায়ু অগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। এই ব্যাধি উপযুক্ত সময়ে সুচিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হয়। সমান বায়ু

স্থানচ্যুত হইলে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ সমান বায়ু প্রাণ ও অপানের সমতা রক্ষা করিতেছে। প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এই ব্যারামে শ্বাস প্রশ্বাসের কৃচ্ছ্রতা অনুভব হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হয়। প্রাণবায়ুর বিকৃতি ঘটিলে উদান ও ব্যান বায়ুর ও বিকৃতি ঘটে, এই জন্য এই ব্যারামে বাক্যোচ্চারণ ও অধিক কথা বলিলে কষ্ট অনুভব ও শারীর সন্ধি সমূহে (ব্যানবায়ুর স্থানে) বেদনা অনুভূত হয়। সুচিকিৎসিত হইলে শরীরের দাহ ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর হইতে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্ম্মে আসে; তৎপরে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ ঐ স্থানের নিম্নের মাংসপেশীর ভিতরে জ্বালা অনুভব হয় এবং জঠরানল স্বস্থানে প্রবেশ করিলে মলের এবং শ্বাসবায়ুর অত্যধিক উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। জঠরানল স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এই ব্যাধিতে ক্ষুধা একবারেই থাকে না। উদান বায়ুর বিকার ঘটে বলিয়া এই ব্যারামে রোগীর কর্ম্মে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। শরীরে শক্তিহীনতা অনুভব হয়, কারণ উদান বায়ুতে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিনটী অবস্থান করিতেছে। জঠরানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে বলিয়া এই ব্যারামে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার লক্ষিত হয়। ছয়টী ইন্দ্রিয়বিকার এই:— চর্ম্মে প্রদাহ হয়। চক্ষু হইতে জল পড়ে ও দৃষ্টিশক্তির হীনতা হয়, কর্ণ ও নাসিকার স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ অসাড় ও চিনচিন করে। মনের চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। মুখ-বিবরের সমান্তরালে মেরুদণ্ড হইতে গুহ্যদেশ (মূলাধার) পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে sympathetie system রহিয়াছে, ইহাই যোগিগণের যোগ সাধনের পথ। এই বাতরক্ত ব্যাধিতে উক্ত sympatheticএর বিকার ঘটে, তাহাতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতি ষটচক্রের স্থান গুলিতে এবং ভ্রূযুগলের মধ্য বর্ত্তী স্থানে (ইহাও একটী ষটচক্রের স্থান) পাঁচড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র বিস্ফোটক জন্মে অথবা ঐ স্থান গুলিতে বেদনা অনুভূত হয় এবং এই sympathetic এর কেন্দ্র pituitary bodyর বিকার হয় বলিয়া নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইবার কালীন হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর বক্রতা এবং ভ্রূযুগল, ওষ্ঠদ্বয় ও হস্তপদাদির স্নায়ু সমূহের চিনচিনানি অনুভূত হয় কারণ, pitutay bod তে নিদ্রার কেন্দ্র অবস্থিত আছে। এই ব্যাধি উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

আশ্বমেধিক পর্ব্বের উদ্ধৃত অংশ হইতে বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয়—তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বাক্য তেজোময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাক্য উচ্চারণ করিলে শরীরে শক্তির হীনতা লক্ষিত হয়। এই জন্য মহাভারতকার অনেক স্থলে মৌনীব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাক্যোচ্চারণে শরীরে শক্তির হীনতা হয় বলিয়া "আত্মা বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন"—ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। মন তৎপরে জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে। বাক্যোচ্চা-

রণের পূর্ব্বে জঠরানল সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় কথা বলা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, যে সময়ে অগ্নি স্থির ভাবে প্রজ্জলিত হয়, তখন তাহাতে দাহ্য বস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা শীঘ্র এবং সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। যদি অগ্নি বিচলিত হয়, তাহাতে দাহ্য পদার্থ দিলে তাহা শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। প্রধানতঃ এই জন্যই বাক্যোচ্চারণ কালীন অগ্নি সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় বাক্যোচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটী কথা এই যে, যত অধিক জোরে বাক্যোচ্চারণ করা যায়, জঠরাগ্নিও তত অধিক মাত্রায় সঞ্চালিত হয়। এই জন্যই উচ্চভাষণ আয়ুর্ব্বেদে অনেক ব্যারামের নিদানরূপে উক্ত হইয়াছে এবং অনুচ্চস্বরে কথা বলা অত্যন্ত হিতকর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

জঠরানল সঞ্চালিত হইলে তদ্বারা প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে (মূলাধারে—In Front of last coccy geal vetebra ও লিঙ্গমূলের সমসূত্রপাত স্থানে) গমন করে। মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া ঐ বেগ (vibration) পুনরায় নাভিমণ্ডলে আসে এবং নাভিমণ্ডল হইতে উদান বায়ু দ্বারা (Afferent sensation of vagus) মস্তকে নীত হয় এবং তাহা পুনরায় vagus এর Recurrent Laryngeal অংশ (ব্যান বায়ু) দ্বারা কণ্ঠ তাল্বাদি স্থানে অভিহিত হইয়া বেগবশতঃ বাক্যরূপে উচ্চারিত হয়। বাতরক্ত ব্যারামে জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং উদান বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর বিকৃতি ঘটে বলিয়া ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই বাতরক্ত ব্যারামে (Gout) উদান বায়ু বিকৃত হইয়া বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করে এবং তজ্জন্য রোগী বাক্যোচ্চারণ করিতে গেলে নাভিপ্রদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উদান বায়ু বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়া অনুভব করিতে পারে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে Splanclinic area হইতে vagus দিয়া একটী Afferent Sensation মস্তকে যায়—এই টুকু মাত্র অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে যে বেগ উৎপত্তি হয় তাহা অপানে মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া আসে বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অনেক স্থলে মূলাধার শক্তিই বাক্যোচ্চারণের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমি এক্ষণে বাতরক্ত ব্যারামের চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গন্ধক, Sulphar জঠরানলের ক্রিয়াকে প্রকৃতিস্থ করে, তজ্জন্য গন্ধকই এই ব্যাধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসকগণ এই ব্যারামে হরিতাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও Sulphar গন্ধক gout এর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ এবং রোগিগণ যে সকল স্থানের জলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক (Sulphar) থাকে তথায় কিছুকাল বাস করেন। গন্ধকও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাশ্চাত্য জগতে বহু মনীষি জঠরানল (Splanclinic area) আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু

আর্য্যঋষিগণ এবিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহার অতি অল্পমাত্রই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এলোপ্যাথিক ঔষধ সমূহের ক্রিয়ার বিভিন্নতা দিন দিন যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা যে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন তদ্রূপ আশা করা দুরাশা মনে করিনা।

আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ বাতরক্ত ব্যারাম সুখী ও ভোগী ব্যক্তির হইয়া থাকে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও gout is a rich man's disease ঠিক এই কথায় প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল পাকবিধি।

(সমালোচনা)

—•:০:•—

(কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন)

জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত জাতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তাই মধ্যযুগের অবনতির ফলে আজ আমরা বহু আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি লাভে বঞ্চিত। বর্ত্তমানে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আধুনিক গ্রন্থাদি দেখা যায়, তাহাতে বহুগ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সে সমস্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, বটীকা, মোদকাদির উল্লেখ ছিল, তন্মধ্যে যে সকল যোগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া মহামতি চক্রপাণি দত্ত "চক্রদত্ত" নামে এক উপাদেয় সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থই বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজকে ঘৃত-তৈলাদি ঔষধার্থে ব্যবহারে অন্ধের যষ্টির ন্যায় সাহায্য করিতেছে। শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থখানিও বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসক সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চক্রদত্ত ও ভাবপ্রকাশ উভয়ই বর্ত্তমানে দায়িত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিরাজমান।

যাঁহারা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, বাগ্ভট্টাচার্য্যের অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি প্রাচীন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে বহু ঘৃত-তৈল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও ঘৃত-তৈলের মূর্চ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও অপরাপর লুপ্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত

চক্রদত্ত নামক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বিক্ষিপ্ত পরিভাষার সহিত বহু ঘৃত-তৈলাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের মূর্চ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি, চক্রদত্ত প্রণীত হওয়ার বহু পরে শিবদাস সেন উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা করিয়া যেখানে যেখানে পরিভাষার প্রয়োজন—সেই সেই স্থানেই উপযুক্ত পরিভাষার সমাবেশ করেন, কিন্তু শিবদাস সেনের টীকাতেও কোথাও ঘৃত তৈলের মূর্চ্ছার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই। ভাবপ্রকাশ একখানা আধুনিক গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলে পর তাহাদের সংসর্গে ফিরঙ্গ (বর্ত্তমান সিফিলিজ) নামক সংক্রামক ব্যাধি প্রথমে আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়। ফিরঙ্গ রোগ এদেশে সংক্রমণের কথা ও তাহার চিকিৎসা একমাত্র "ভাবপ্রকাশ" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং ভাবপ্রকাশ যে কোন্ সময়ের রচিত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। এই গ্রন্থেও বর্ত্তমানে ব্যবহৃত বহু ঘৃত তৈলাদির উল্লেখ আছে এবং পরিভাষা অধ্যায়ে তাহাদের পাকবিধির সরলভাবে উল্লেখ আছে, অথচ মূর্চ্ছা পাক সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছা বিধি চরক-সুশ্রুতাদি ও বাগভট্টাচার্য্যের সময়ে তো ছিলই না, এমন কি ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত প্রণীত হওয়ার সময়ে এবং চক্রদত্তের টীকা করার সময়েও উহা প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত যুক্তিতে যদি কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এমন অনেক বিধি থাকিতে পারে—যাহা অতি প্রাচীন লুপ্ত গ্রন্থে ছিল এবং উহা আধুনিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিয়া যে পূর্ব্বে মূর্চ্ছা বিধি ছিল না তাহার প্রমাণ কি? প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই "ভাবপ্রকাশে" পরিভাষার জন্য পৃথক ভাবে একটী অধ্যায় করিয়া ঘৃত-তৈলাদির পাক বিধি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় মূর্চ্ছাবিধি রূপ একটা স্থূল বিষয় প্রচলিত থাকিলে তাহার পরিহার কি সম্ভব? আবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চক্রদত্ত বর্ত্তমানে ঘৃত তৈল ঔষধার্থ ব্যবহারের উপদেশ পূর্ণ একমাত্র উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে চক্রপাণি দত্ত প্রয়োজন বোধে বহু পরিভাষার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছাবিধি তাঁহার সময় প্রচলিত থাকিলে তাহা তিনি স্থান দিতেন না কি? গ্রন্থে এত পরিভাষার স্থান দিয়া এমন একটা গুরুতর বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন - একথা কি বিশ্বাস যোগ্য এবং শিবদাস সেন মহাশয় চক্রদত্তের টীকা করিতে যাইয়া পুস্তকের প্রায় প্রতি পাতায় পাতায় বহু পারিভাষিক বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, প্রয়োজন বোধে এক পরিভাষার পুনঃ পুনঃ উল্লেখেরও ক্রটী করেন নাই। এমতাবস্থায় ঘৃত ও তৈল মূর্চ্ছাবিধি রূপ একটা প্রকাণ্ড বিষয়ে উল্লেখে তিনি অবহেলা করিয়াছেন একথা কে বিশ্বাস করিবে? আরও এক কথা, যাঁহারা চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থ পড়িয়াছেন,তাঁহারা যদি পরিভাষা প্রদীপোক্ত মূর্চ্ছাবিধির ভাষার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করেন, তবে উক্ত প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষার সহিত উহার ভাষাগত বহু পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন এবং ভাষাতেই যেন উহার আধুনিকত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন। সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মূল শ্লোক তোলা হইল না। মূর্চ্ছা বিধির আধুনিকত্ব সম্বন্ধে এতগুলি অকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই যে, প্রাচীন কোন লুপ্ত গ্রন্থে ইহা ছিল, তবে বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যা'ক। মূর্চ্ছা বিধি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত থাকিলে ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত অথবা চক্রদত্তের টীকায় উল্লেখ না থাকার কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? শ্রীমিশ্রভাব, চক্রপাণি দত্ত এবং শিব দাস সেন মূর্চ্ছা বিধিকে অযৌক্তিক ভিত্তিহীন এবং সমর্থনের অযোগ্য মনে করায় উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন গ্রন্থে স্থান দেন নাই,—ইহাই কি একমাত্র অনুল্লেখের কারণ বলিয়া এক্ষেত্রে নির্দ্দেশ করা যায় না? যাহা মিশ্রভাব, চক্রপাণি প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণ সমর্থন করেন নাই, তাহার সমর্থন ও প্রচারের আমাদের কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? যাহা হউক মূর্চ্ছা বিধির প্রাচীনত্বের কল্পনা নিতান্ত কষ্টকল্পনা মাত্র।

এই সমস্ত কারণ হইতে ঘৃত তৈলের মূর্চ্ছা বিধি যে আধুনিক ও মধ্যযুগে কোন বৈদ্য কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে বিচার্য্য, আমাদের বর্ত্তমানে ব্যবহৃত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি চক্রদত্তে উক্ত আছে। কাজেই প্রাচীন এবং মূর্চ্ছা বিধি আধুনিক, এমন অবস্থায় মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণ যুক্তিযুক্ত কি না? অনেকেই হয়তো বলিতে পারেন - মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক হইলেও বৃদ্ধ বৈদ্যব্যবহারসম্মত বলিয়া চিকিৎসক সমাজে আদৃত হইতেছে এবং পরিভাষা প্রদীপেও সাদরে স্থান পাইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বক্তব্য, বৃদ্ধবৈদ্য-ব্যবহারসম্মত বলিয়াই যে বিনা বিচারে যে কোন বিষয় অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে—তাহার অর্থ কি? "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম", কেহই বলিতে পারেন না যে আমি অভ্রান্ত, যদি মূর্চ্ছাবিধি সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তবে কেবল বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়া "দাদা বলেছেন ভানৃতে ধান, ভান্‌তে আছি ওদা ধান"—এই মতের সমর্থন করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। প্রথমে দেখা যাক্ কি কারণ প্রদর্শন করিয়া ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছার প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। ঘৃত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "তস্মাদামোপ দোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি"। অর্থাৎ ইহাতে ঘৃতের আমদোষ নষ্ট হয় এবং উহা বীর্য্যশালী ও সুখদায়ক হয়। সর্ষপ তৈল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "কটু তৈলং পচেৎ তেন আমদোষ হরং পরম্"। এখানে কেবল আমদোষ নাশের জন্য মূর্চ্ছার উল্লেখ দেখা যায়। এড়ণ্ড তৈল সম্বন্ধে কিছু উক্ত না থাকিলেও উহার সম্বন্ধে আমদোষ নাশ ও উত্তম গন্ধ বর্ণের জন্য মূর্চ্ছা পাক বুঝিতে হইবে। আর তিল তৈল সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, "দুর্গন্ধং বিনিহন্তি তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে" অর্থাৎ মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণ বর্ণ হয়।

প্রথমে দেখা যাক, আমদোষটা কি।

ঘৃত সম্বন্ধে আমদোষ কল্পনা একটা কথার কথা বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত অনেকে কাঁচাই গরম ভাতের সঙ্গে খান, অথবা ডাল, তরকারী, মাংস, পোলাও প্রভৃতিতে প্রক্ষেপ রূপে দিয়া খাইয়া থাকেন। মিঠাইওয়ালাদের বহু মিঠাই ঘৃতে পক্ক হয় এবং তাহা অতি উপাদেয় জলখাবার বলিয়া সাধারণ্যে বাহুল্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল ঘৃত কিন্তু মূর্চ্ছাপক্ক নহে। উহার এবম্বিধ ব্যবহারে আমদোষ প্রযুক্ত কোনরূপ অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা করেন কি? পারদের অষ্টমহাদোষ ও সপ্তকঞ্চুকাদি অথবা তাম্রের ভ্রান্তি বাস্তাদি দোষের ন্যায় ঘৃতে কোনরূপ অনিষ্টকারী বা মারাত্মক দোষ আছে কি, যে দোষ দূর করিতে হরিদ্রা লেবুর রস, ত্রিফলা প্রভৃতির সহিত ঘৃত সংস্কৃত হওয়ায় দরকার? আম শব্দের অর্থ অপক্ক, ঘৃত অগ্নিজালে নিফেন হইলে অথবা কাথ ও কল্কাদির সহিত পক্ক হইলে ঘৃতের অপকত্ব কোথায় যাইবে? অগ্নিজালে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে উক্ত জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চলিয়া যায় এবং তৈলের আমত্ব দূর হয়। এড়ণ্ড তৈল অত্যন্ত বিরেচক ও খাদ্যরূপে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া উহা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু সর্ষপ তৈল বা তিল তৈল রন্ধনাদি কার্য্যে প্রত্যহ প্রতি গৃহে বিনা অনিষ্টপাতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রন্ধনাদি কার্য্যে নিপুণ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে কটাহে তৈল দিয়া উহা নিফেন না হইতে যদি উহাতে বেগুণ প্রভৃতি ভাজা হয় অথবা ডাল প্রভৃতির সম্ভার দেওয়া হয়, তবে উক্ত খাদ্যদ্রব্যে কাঁচা তৈলের গন্ধ অনুভূত হয়, কিন্তু তৈল নিক্ষেপ হইলে খাদ্য দ্রব্যে উক্ত দোষ দাঁড়ায় না। তৈলে উক্ত জলীয় ভাগের বিদ্যমানতাকেই একমাত্র আমদোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ দোষ তৈলে নাই। যদি আমদোষ বলিয়া অনিষ্টকারী বা মারাত্মক কোন দোষ তৈলে থাকিত তবে উক্ত তৈলাদি খাদ্যদ্রব্যে যথেচ্ছাভাবে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইত কি? আরও এক কথা, পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক, কাজেই মূর্চ্ছাবিধি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে চক্রপানিদত্ত, শ্রীভাব মিশ্র, বাগভটাচার্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেন আমদোগ প্রযুক্ত তাহাদের ঔষধ কোনরূপ অনিষ্টকারী হইত কি? আমদোষ শব্দের উল্লেখ করিয়া বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপ করা হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রযুক্ত যে কি অনিষ্টপাত হইতে পারে তাহার কিছু উল্লেখ নাই কেন? স্থূল কথা মধ্যযুগে উপযুক্ত চর্চ্চা ও প্রচারের অভাবে আয়ুর্ব্বেদ এত অল্প সংখ্যক চিকিৎসকের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তখন যে কোন বিষয় বিনা আপত্তিতে আয়ুর্ব্বেদে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়ায় বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাই আমার বিশ্বাস কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী চিকিৎসক মধ্যযুগে বাহাদুরী লুঠিবার জন্য ঘৃত ও তৈলে আমদোষের আরোপ করিয়া বহু মাথা ঘামাইয়া মূর্চ্ছাবিধির সৃষ্টি করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপকার দিয়াছেন। এই গেল আমদোষ সম্বন্ধে কথা।

অতঃপর তিল তৈল মূর্চ্ছাবিধিতে যে উক্ত হইয়াছে, "মূর্চ্ছাদ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া

তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়" যে সম্বন্ধে সমালোচনার প্রয়োজন। তিল তৈলে কাঁচা তিলের গন্ধ বিদ্যমান। ইহা ভিন্ন এমন কোন অপ্রীতিকর বা পূতিগন্ধ ইহাতে নাই যাহাতে উহার গন্ধে রোগীর বমন অরুচি অথবা অন্য কোন উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে। অবশ্যই বর্ত্তমানে বাজারের ঘৃত তৈলাদি নানাপ্রকার ভেজালে পরিপূর্ণ কাজেই নানাপ্রকার অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত ও ঔষধার্থ অযোগ সুতরাং উহা আমাদের সমালোচনায় স্থান পায় না। যাহা হউক তৈলে কাঁচা তৈলের গন্ধ অগ্নিজ্বালে নিক্ষেপ হইলেই অনেকাংশে দূর হয়। শাস্ত্রোক্ত বিশেষ তৈলের কল্কদ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধদ্রব্যের এবং অরুণ বর্ণোৎপাদক মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম প্রভৃতির বিদ্যমানতা দেখা যায় উহা দ্বারাই তৈলের সুন্দর গন্ধ ও বর্ণ সম্পাদিত হয়। (গন্ধপাকবিধি সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে পরে আরও দ্রষ্টব্য)। স্থূল কথা আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলাদি বিলাসের বস্তু নহে গন্ধবর্ণের প্রতি বিশেষ ঝোক না দিয়া যাহাতে তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হয় তাহারই চেষ্টা চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অতঃপর আমাদের বিচার্য্য, মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা ঘৃত তৈলাদির গুণহানি বা গুণ বিপর্য্যায় হইতেছে কিনা। গুণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সমালোচনা হইতে "মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা ঘৃত বীর্য্যশালী ও সুখদায়ক হয়" এই উক্তি কতদূর অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। ঘৃত এবং তৈলের দ্রব্যবিশেষের সহিত সংস্কৃত হইয়া প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যাধি নাশের শক্তি অর্জ্জনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই উহারা ঔষধার্থ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ঘৃত ও তৈল যে জিনিষের সহিত সংস্কৃত হইবে তাহারই গুণ গ্রহণ করিবে ইহাই তাহাদের স্বভাব। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির ভাবের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদের কাথ্যদ্রব্যের এবং কল্ক দ্রব্যের উপাদান নির্ব্বাচনে এবং তাহাদের মাত্রা নির্দ্ধারণে বহু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, কল্ক ও কাথ্য দ্রব্যে উপাদান নির্ব্বাচন বিষয়ে লক্ষ্য করিলে এমন অনেক দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় যাহা ব্যাধি বিপরিত বলিয়া সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হয় অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য কেন দেওয়া হইল তাহা নিরূপণই করা যায় না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাবলী আর্য্যঋষিদিগের যোগ দৃষ্টীপ্রসূত। দশদিক ঠিক রাখিয়া উপাদান এবং তাহাদের মাত্রা নির্দ্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র তাহাদেরই ছিল। তাহারা কোথাও এক দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা অন্য দ্রব্য প্রয়োগে নষ্ট করিয়া, কোথাও প্রকৃতিসম সমবায় দ্বারা, আবার কোথাও বিকৃতি বিষম সমবায় দ্বারা অভিষ্ট গুণ লাভ করিতেন। এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির উপাদান সমূহের ও তাহাদের মাত্রার পরিবর্ত্তন করা চলে না। উহাদের পরিবর্ত্তন ঘটাইলে ক্ষেত্র বিশেষে উপাদান বিপর্য্যয়জনিত দোষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রা বিপর্য্যয়জনিত দোষ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ঔষধের গুণের পরিবর্ত্তও অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈলাদি প্রাচীন এবং মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক; আধুনিক মূর্চ্ছা যে ঘটিতেছে না, একথা অস্বীকার করার উপায়

নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, সমান গুণ সমান গুণের বৃদ্ধি করে এবং বিপরীত গুণ বিপরীত গুণের হ্রাস করিয়া থাকে। কাজেই মূর্চ্ছা ক্রিয়ায় মূর্চ্ছা দ্রব্য হইতে যে গুণ স্নেহে দাঁড়ায়, সেই গুণ স্নেহের ক্বাথ ও কল্ক পাকজনিত গুণের সহিত পরস্পর উপহত হইয়া ক্বাথ ও কল্ক পাক জনিত গুণের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। মনে করুন প্লীহা-যকৃদাধিকারোক্ত "পিপ্পলীঘৃত" পাক করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মূর্চ্ছা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ৪ সের ঘৃত ১ সের পিপ্পলী ১৬ সের দুগ্ধের সহিত যথা নিয়মে পাক করিলে উক্ত ঘৃতে পিপ্পলীর উষ্ণবীর্য্যত্ব কটুরসের প্রাধান্য এবং প্লীহা, যকৎ, ক্ষয় কাস প্রভৃতি রোগ নাশের শক্তি দাঁড়াইল, কিন্তু যদি ঐ পিপ্পলী ঘৃত পাক করিতে পূর্ব্বে হরিদ্রা, লেবুর রস, ত্রিফলা, মুতা প্রভৃতির সহিত মূর্চ্ছা পাক করিয়া পরে উপরোক্ত ঘৃত পাক করা হয়, তবে মূর্চ্ছা দ্রব্যের তিক্ত-মধুর-কষায়-অম্ল রসাদি দ্বারা ঘৃতের কটু রসের প্রাধান্য অনেকটা নষ্ট হইবে, এইরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মুর্চ্ছাপক্ক ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ও মূর্চ্ছা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহা এক জিনিস নয় এবং তাহাদের গুণও এক হইতে পারে না। ফলতঃ মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা ঘৃতের রস, বীর্য্য, বিপাকাদির পরিবর্ত্তনই গুণ-বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। ঘৃত সম্বন্ধে যেরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তৈল সম্বন্ধেও সেই কথা। অনেকে হয় তো কোন কোন ঘৃত বা তৈলের মূলোক্ত জায়ে মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির বিদ্যমানতা দেখাইয়া মূর্চ্ছা পাকের অপকারিতার অস্বীকার এবং পক্ষান্তরে স্নেহের গুণোৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াসী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে মূল ঔষধের উপাদান ও মাত্রাবিপর্য্যয়জনিত দোষ ঘটে। মনে করুন, কোন তৈলের কল্ক দ্রব্যে ২ তোলা মঞ্জিষ্ঠা দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু মূর্চ্ছা পাকে সেই তৈল ১৬ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত পক্ক হইয়াছে; তবেই মোটের উপর সেই তৈল ২ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ার পরিবর্ত্তে ১৮ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ায় মঞ্জিষ্ঠার আধিক্যে তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। আবার মনে করুন, কোন তৈলে মঞ্জিষ্ঠা উপাদান রূপে বর্ত্তমান নাই, এক্ষেত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে ১৬ তোলা মঞ্জিষ্ঠার গুণ বর্ত্তাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্তগুণের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। স্থূল কথা মূর্চ্ছাবিধি মানিয়া চলিলে ঘৃত-তৈলাদির জায়ে মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির উল্লেখ থাকিলে মাত্রা-বিপর্য্যয়জনিত দোষ আর জায়ে উক্ত দ্রব্যাদির উল্লেখ না থাকিলে উপাদান-বিপর্য্যয়জনিত দোষ অপরিহার্য্য। সুতরাং যদি ক্ষেত্রবিশেষে মূর্চ্ছিত ঘৃত ও তৈল দ্বারা প্রস্তুত কোন কোন ঔষধের গুণোৎকর্ষও হয়, তবুও উহাকে আমরা প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ উহারা ঠিক শাস্ত্রোক্ত ফল প্রদান করিবে কিনা সন্দেহ।

অতঃপর মূর্চ্ছাপাকে এই বলিয়া আপত্তি চলিতে পারে যে, মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে স্নেহের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হয়, কাজেই মোটের উপর প্রত্যেক ঘৃত ও তৈলেই একটা কল্ক পাকের তুল্য অগ্নিজ্বাল বেশী

পড়ে, সুতরাং উহাতেও গুণের কিছু পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করা যায়।

মূর্চ্ছাবিধি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আপত্তির উল্লেখ করিয়া প্রয়োজন বোধে তৈলের গন্ধপাক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। মূর্চ্ছা বিধির ন্যায় গন্ধপাক বিধিও আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত, কারণ উহাও কোন মূল প্রাচীন গ্রন্থে অথবা দায়িত্ব পূর্ণ প্রামাণ্য আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। চক্রদত্তে মহারাজ প্রসারণী, মহাসুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি তৈলে যে গন্ধপাক বিধি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তত্তৎ তৈল সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সমস্ত তৈলের জন্য সাধারণ গন্ধপাক বিধির কুত্রাপি উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল সমূহ বিলাসের সামগ্রী নহে, কাজেই উহার গন্ধবর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।* বর্ণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত তৈল প্রস্তুত করিতে যাইয়া যে বর্ণ হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে গন্ধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপ্রীতিকর গন্ধ হইলে রোগীর বমন, অরুচি অথবা অন্য কোনরূপ উদ্বেগ জন্মাইতে পারে। যাঁহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে আমি চক্রদত্তোক্ত তৈল সমূহের কল্ক দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক অধিকারোক্ত প্রায় প্রত্যেক তৈলেই কল্ক দ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধ দ্রব্য বিদ্যমান। বাতব্যাধি অধিকারোক্ত তৈল গুলিতে গন্ধদ্রব্য বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। আর যাঁহারা তৈলকে অরুণবর্ণ করিতে ব্যগ্র, তাঁহারাও দেখিবেন যে, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লাক্ষা, কুঙ্কুম প্রভৃতি অরুণবর্ণোৎপাদক উপাদানও অল্পাধিক ক্রমে প্রায় অধিকাংশ তৈলেই বিদ্যমান। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আয্যঋষিগণ তৈলাদিতে গন্ধবর্ণ উৎপাদন বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না। দশদিক বিচার করিয়া, তৈলের প্রকৃত গুণ ষোল আনা বজায় রাখিয়া যে যে তৈলে গন্ধবর্ণ উৎপাদনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেই সেই তৈলেই তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে ক্রটী করেন নাই! এমতাবস্থায় পরিভাষা প্রদীপোক্ত প্রক্ষিপ্ত গন্ধপাক বিধির অনুসরণ করিয়া পুনরায় গন্ধপাক দ্বারা মাত্রা বিপর্য্যয় জনিত অথবা উপাদানবিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের হানি করা অথবা গুণের পরিবর্ত্তন ঘটান যুক্তি সঙ্গত কি?

ঘৃত ও তৈল পশ্চিম দেশে কিরূপে পাক করা হয়, সে দেশেও মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি প্রচলিত আছে কিনা, গোবিন্দ সেনের পরিভাষা প্রদীপের মত কোন পরিভাষা গ্রন্থ বাঙ্গালার বাহিরে আছে কিনা—সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের কোনই সুযোগ অদৃষ্টে ঘটে নাই।

অতঃপর ঘৃত ও তৈল পাকের পাত্র সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়োজন। পরিভাষায় উক্ত আছে, "পাত্রেঽষুক্তেতু মৃন্ময়ম্"—অর্থাৎ যেখানে পাত্র বিশেষের

* একথা ঠিক কি? বর্ণ, গন্ধ ও রসোৎপাত্ত যে স্নেহপাক সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। স্নেহপাক ঠিক হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে গন্ধ ও বর্ণের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা—
য..দা ফেনোদ্গম তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা।" আঃ সং

এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা ইহার সমর্থন সূচক প্রবন্ধ পাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব। আঃ সং

উল্লেখ না থাকিবে—সেখানে মৃৎপাত্র বুঝিতে হইবে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রায় ষোল আনা কবিরাজই বর্ত্তমান সময়ে লৌহ-কটাহ অথবা রাঙ্গ দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্র তৈল-ঘৃতাদির পাকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ শাস্ত্রবিধি মানিলে কতিপয় উল্লিখিত স্থান ব্যতীত সমুদয় ঘৃত ও তৈলই মৃৎপাত্রে পাক করা উচিত। প্রথমে লৌহ পাত্র সম্বন্ধে বিচার করা দরকার। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কবিরাজমাত্রেই অবগত আছেন যে, পাশ্চাত্য রসায়নে যাহাকে এসিড (Acid) বলে, তাহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত অম্লরস। প্রায় সমস্ত ধাতুই অম্লরস (Acid) সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় যে তৈল বা ঘৃত আমরা লৌহ পাত্রে পাক করিতে যাইতেছি, তাহাতে ত্রিফলা, কাঞ্জি, দধি, লেবুর রস অথবা অন্য কোন অম্লরসান্বিত দ্রব্য উপাদান রূপে আছে কিনা—তাহা বিচার্য্য। যদি না থাকে, তবে লৌহ পাত্রে উক্ত স্নেহ পাকে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি অম্লরস বিদ্যমান থাকে, তবে উহা লৌহ-কটাহের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা লৌহের দ্রাবণ করিয়া ঔষধের গুণহানি করিবে। যদি কেহ বলেন যে, এত জিনিসের ভিতর ২।১ তোলা ত্রিফলার অম্লরসে ঔষধের কি হানি করিতে পারে? কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, জল মিশ্রিত এসিড (diluted acid) হীনশক্তি হইলেও উত্তপ্ত করিলে উহার শক্তি বাড়ে এবং তখন ধাতু সমূহের দ্রাবণ করিতে পারে; আর স্নেহ পাকে কাথ বা জল যতই কমিতে থাকিবে, অম্লরস ততই শক্তিশালী হইবে, কাজেই তখন উহা যথাশক্তি লৌহ পাত্রের দ্রাবণ করিবে।

লৌহ পাত্র সম্বন্ধে যেরূপ আপত্তি প্রদর্শিত হইল—তাম্র পাত্র সম্বন্ধে সে আপত্তি তো আছেই, ইহা ভিন্ন আরও গুরুতর আপত্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। "ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে"। বিষকেই কেবল বিষ বলে না, তাম্রও একটা ভয়ঙ্কর বিষ। অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, মূর্চ্ছা, বিদাহ, বমনবেগ, শোষ, বমন, অরুচি ও চিত্তসন্তাপ এই আটটী বিষোপম দোষ দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কেবল রাং দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্রে ঘৃত তৈলাদি পাক করা কতদূর নিরাপদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য। তাম্র - আয়ুর্ব্বেদে অম্ল-মধুর-কষায়-তিক্ত রস বলিয়া উক্ত আছে। কাজেই অম্লরস—স্নেহ পাকের তাম্রপাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাম্র পাত্রে পক্ব অন্ন আহার করিলে বমন উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাম্র পাত্রে ঔষধাদি পক্ব হইলে কতদূর অনিষ্টকারী হইতে পারে। রাং দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্রে পক্ব স্নেহে যে কোন রূপ দোষ দাঁড়ায় না—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না; কারণ অম্লরস রাঙ্গেরও দ্রাবক। কলাই যতদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে, ততদিন তাম্র পাত্রে পাকজনিত দোষ স্নেহে সাধারণ ভাবে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কলাই কতক উঠিয়া গেলে সে পাত্রে পক্ব স্নেহ বহুবিধ অনিষ্টকারী হইতে পারে।

অনেকে মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত

হইতে হইবে এই ভয়েও মৃৎপাত্র ব্যবহার করেন না, কিন্তু সাবধানতার সহিত কার্য্য করিলে ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? আর ভয় কোন কাজেই বা না আছে? সকল কাজেই অকৃতকার্য্যতার ভয় থাকিবেই; তাই বলিয়া কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে চলে না।

আমাদের দেশে মাটির হাঁড়িতেই প্রায় প্রত্যেক পরিবার ভাত পাক করেন এবং এই সকল হাঁড়ির এক একটিতে একমাস, দুইমাস অথবা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত রন্ধনাদি কার্য্য চলে। যাহা হউক সকল কাজেই সাহসের উপর নির্ভর না করিলে সুসিদ্ধ হয় না, ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "cowards die many times before their death!"

উপসংহারে বক্তব্য, এই বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রোগ শান্তির জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত মুখ্যভাবে ঘৃত তৈলাদির প্রায়ই ব্যবস্থা দেন না, ঘৃত ও তৈলাদি প্রয়োগের চিকিৎসা যেন ক্রমেই উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার একমাত্র কারণ ঘৃত, তৈলাদির ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র আশানুরূপ আশু সুফল লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত কারণাদি হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঘৃত-তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ না হওয়ার প্রধান কারণ মূর্চ্ছাপাক এবং (তিল তৈলে) গন্ধপাক বিধির অনুসরণ এবং মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহ বা তাম্র পাত্রে উহাদের পাক সমাধান। উপরোক্ত সমালোচনা দৃষ্টে আমার কোন বন্ধু বলিয়াছেন যে; মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধে কতদূর ফল লাভ হইবে—তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ এবং বহু-প্রয়োগ দ্বারা তাহা নির্ণেয়। তদুত্তরে আমার বক্তব্য, মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিতে যাইয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদে একটা নূতন কিছু করিতে যাইতেছি বলিয়া মনে করা ভ্রম। যাহা বাগভটাচার্য্য, শ্রীমিশ্রভাব এবং চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের সময় প্রচলিত ছিল না, মধ্যযুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, সে বিধি উঠাইয়া দিতে ঘৃত তৈলাদির গুণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উক্ত বিধিদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া বাগভটাচার্য্য, মিশ্রভাব, চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ঘৃত তৈলাদিতে সুফল লাভ করিলে আমরা কেন তাহাতে বঞ্চিত হইব? ঘৃত-তৈলাদির গুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণ করিয়া ঐ ঘৃত তৈলাদি পাক করিয়া প্রয়োগে তদনুযায়ী ফল লাভ অধিকাংশ কবিরাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়া উঠিতেছে না কেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, রোগী বহুকাল ঘৃত-তৈলাদি ব্যবহারেও আশানুযায়ী বিশেষ কোন ফল লাভ না করায় চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে, কবিরাজ মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলেন, "হাঁ, কবিরাজী ঘৃত-তৈলাদিতে একটু বিলম্বেই ফল লাভ হয়।" কি লজ্জার কথা! কি পরিতাপের বিষয়! আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত-তৈলাদির গুণশ্রুতি কি মিথ্যা ও অসার না আমরা নানারূপ অনাচারে উক্ত ফল লাভে বঞ্চিত?

অতঃপর আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য, ঘৃত ও তৈল সম্বন্ধে

সমালোচনার অবতারণা করিয়া আমি যে অভিমত ব্যক্ত করিলাম তাহা যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণ যোগ্য কি না এবং এমন কোন প্রবল যুক্তি বিদ্যমান আছে কিনা—যদ্দারা মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি সমর্পণ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশই আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও প্রচার সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া আমার সানুনয় নিবেদন এই, তাঁহারা যদি স্বীয় স্বাধীন চিন্তা দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া আমার মতের পক্ষপাতী হন,তবে আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য উক্ত প্রক্ষিপ্ত মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে অপসারিত করিয়া ঘৃত-তৈলাদিকে মেঘ মুক্ত সূর্য্যবৎ প্রতিভাত করিবার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—তাহা যেন সত্বর নির্দ্ধারণ করেন। সর্ব্বশেষে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট আমার সানুনয় নিবেদন.—তাঁহারা যদি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য বঙ্গীয় কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলীর সহিত এক সভা আহ্বান করিয়া সভার সিদ্ধান্ত পত্র দেশময় প্রচার করিয়া দেন, তবে আয়ুর্ব্বেদের এবং তৎসঙ্গে দেশের একটা মহান্ কল্যাণ সাধিত হয়।

বনৌষধি।

—:০:—

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ন]

বকুল বৃক্ষ—হিং—মৌলসিরি।

চলিত দন্তে বকুল- যে দন্ত অকালে নড়িয়া শিথিল হইয়াছে, বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে ঐ শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হয়। বকুল ছালের চূর্ণ অথবা ক্বাথ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

দন্ত রোগে।—বকুল ছাল ও বকুল ফল বিশেষ হিতকারী। বকুল ছালের ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ করিয়া ও মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে কবল ধারণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। এবং মুখের ক্ষত ও দুর্গন্ধ দূর হইয়া থাকে। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাবেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

বালকের কোষ্ঠ বন্ধে বকুল—শিশুদিগের কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে বকুল বীজ জলে পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পানের বোঁটা দ্বারা মলদ্বারে বর্ত্তি প্রদান করিলে সহজে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের মল নিঃসরণ প্রশস্ত।

শিরোরোগে বকুল—শুষ্ক বকুল পত্রের ও বকুল ফলের নস্য টানিলে শিরোরোগের উপশম হয়। ইহা শ্লেষ্মা নিবারক। শুষ্ক বকুল পুষ্প চূর্ণ করিয়া নস্য টানিলে নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

অশ্বগন্ধা—হিং অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মুঙ্গের অঞ্চলে অশ্বগন্ধার বহুল উৎপত্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা বেণের দোকানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অশ্বগন্ধা বলকারী, রসায়ন। ইহার সহিত দ্রব্যান্তরযোগে পুষ্টিকারক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ ও নাগর মুথা চূর্ণ—যথাক্রমে চারি আনা ও দুই আ'না মাত্রায় সংমিশ্রণ করিয়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্বাসরোগে অশ্বগন্ধা।—অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া অশ্বগন্ধার মূলের ক্ষার ২ তোলা, গব্য দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইবে ঐ দুগ্ধ বস্ত্রে ছাকিয়া পান করিলে শ্বাস রোগে উপকার হয়।

বাতব্যাধি রোগে অশ্বগন্ধা।—অশ্বগন্ধার কাথ ও কল্কে গব্য ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধসহ যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃত সেবনে বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহা বাতঘ্ন, বৃষ্য মাংস বর্দ্ধক।

শোষ রোগে অশ্বগন্ধা।—অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্য দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুগ্ধ শেষ রাখিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে।

হৃদগত বায়ু রোগে ও হৃদ রোগে অশ্বগন্ধা ১ তোলা গরম জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে হৃদ্‌রোগের উপশম হয়।

অনিদ্রায় অশ্বগন্ধা।—অর্দ্ধ তোলা অশ্বগন্ধা চূর্ণ কিঞ্চিৎ চিনি ও গব্য ঘৃত সহ প্রত্যহ সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন। অশ্বগন্ধার মূল কাঁচা ব্যবহার প্রশস্ত।

পুষ্টিবর্দ্ধনে অশ্বগন্ধা।—প্রত্যহ চারি আনা পরিমাণ অশ্বগন্ধা মূলচূর্ণ, উষ্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দেহ পুষ্টি ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দেশের কথা।—আমাদের দেশে রোগ-বাহুল্যের পরিচয় দেশে চিকিৎসকের আধিক্য দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে। কলিকাতার তো কথাই নাই, কলিকাতার অলিতে গলিতে ডাক্তার-কবিরাজের ছড়াছড়ি! মফঃস্বলেও ইহাদের সংখ্যা কম নহে। আগে এত চিকিৎসকও ছিল না, এত রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটিত না। সুতরাং এখন যে এত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা দেশের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের পরিপরিচয়, তাহা ভাবিবার কথা।

রোগের বাহুল্য। রোগের বৃদ্ধিতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি—আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে রোগের আধিক্য কমিতেছে কই? ম্যালেরিয়া-কলেরা-বসন্ত তো বাঙ্গালায় নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছে, প্লেগ-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বেরিবেরিও আধিপত্য বিস্তার কম করে নাই। মহিলা-সমাজে হিষ্টিরিয়ার বিস্তৃতিও অল্প নহে। হার্টফেল নর-নারীর মধ্যে তো কথায় কথায়। ডিস্‌পেপ-সিয়া বা আমাদের অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য—ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম হইতে না হইতেই বাঙ্গা-

লীর এক চেচিয়া। দেশে চিকিৎসক বাড়িতেছে, অথচ আধিব্যাধির কেন এরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের চিন্তাশীলগণের ইহা ভাবিবার বিষয়।

রোগের কারণ।—কিন্তু চিকিৎসক করিবেন কি? আর্য্য জাতি যে সদাচারভ্রষ্ট হইতেছে, তাহার নিবারণ করিবার উপায় কোথায়? আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সদবৃত্তি পরায়ণ হইবার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে উপদেশ এখন পালন করে কে? যুগ বিপর্য্যয়ে অনাচার-পরায়ণ আর্য্য জাতির এই জন্যই তো দুর্গতি হইতেছে। দেহ ধারণ করিলে রোগভোগ করিতে হইবে, মরিতে হইবে—ইহা সত্য কথা, কিন্তু সেই রোগ ভোগেরও একটা সীমা আছে। পাপের ফল তথা অমিত আহার বিহারাদির ফল রোগোৎপত্তির কারণ- এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। আগেকার লোকে এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতেন,এখনকার মানুষ ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না, ইহাই তো দেশে রোগ-বাহুল্যের কারণ। যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে এ কারণের অপনয়ন না ঘটিবে, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের দেশ হইতে রোগের হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্য্য।—যোগ শাস্ত্রের সার কথা, "চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর।" আগে যে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্যবস্থা ছিল তাহা হইতেই এই উপদেশ পালন করা হইত। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন একান্তই প্রয়োজনীয়। প্রাচীন কালে রাজ পুত্র হইতে পর্ণ কুটীর বাসীর পুত্রকেও গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। এই অবস্থায় তাঁহারা শিক্ষা করিতেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন।
জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

কিন্তু এ শিক্ষা এখন দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। যে ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সকল শিক্ষার ভিত্তিরূপে গৃহীত হওয়া উচিত - সে শিক্ষা আমাদের বালকগণকে আর প্রদান করা হয় না। স্কুল কলেজে সে শিক্ষা প্রদানের তো ব্যবস্থাই নাই, গৃহেও ইহার একান্ত অভাব। ইহার ফলে ছাত্র জীবনে কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর অজীর্ণ—বাঙ্গালীর অম্লপিত্ত সৃষ্টি এবং তাহার ভীষণ ফল বাঙ্গালীর শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি এবং তাহার শেষ পরিণতি বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যভঙ্গ ইহারই ফলসম্ভূত। বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে কে?

বাঙ্গালীর অবস্থা। বাস্তবিক পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা অধিক শোচনীয়। বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দিকে চাহিয়া দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁহাদের অভিভাবকগণ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার ফলে তাঁহারা শিক্ষালাভেও অমনোযোগী নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের

স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচয় তো পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলিতে গেলে অনেকেরই দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অনেকেরই যেন হৃদয়ে শান্তি নাই। এই অবস্থায় কোন একটা প্রবল রোগের আক্রমণ হইলে ইহারা আর সহ্য করিতে পারেন না। সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির অকাল মৃত্যু এইরূপেই বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্যই তো বলিতেছিলাম চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালা দেশে রোগের আক্রমণ কম না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইতেছে।

মরণের কারণ।—বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া-পীড়িত রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালীর মৃত্যুর হারও কম নহে। ইহার কারণও আমরা বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বাঙ্গালী যে অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি তাহারই জন্য কমিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াই বলুন আর কালাজ্বরই বলুন, অথবা অন্য কোনো রোগের কথাই উল্লেখ করুন, সেই রোগের আক্রমণ অল্পপ্রাণ-বাঙ্গালী সহ্য করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু এমনই করিয়াই ঘটিতেছে। এক কথায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে ভীষণ রোগের সঙ্গে যুঝিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। দেশের চিন্তাশীলগণ সকল বিষয় অপেক্ষা এই বিষয়ের চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণা—
আরোগ্যমূলমুত্তমম্"।

"ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন—আরোগ্যই সকল বিষয়ের মূল। সুতরাং সেই আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সেই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পন্থা ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা প্রাপ্তি। বাঙ্গালী বালক যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মৃত্যু-বাহুল্য যে কমিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল। { ২য় সংখ্যা।

চরকের চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যে শাস্ত্রে আয়ুর কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। আয়ু শব্দের অর্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগ। আয়ুর অন্য নাম—ধারি, জীবিত, নিত্য ও অনুবন্ধ। মন, আত্মা ও শরীর—তিন খানি যেন ভিন্ন ভিন্ন যষ্টি; এই তিনের সংযোগেই পুরুষের উৎপত্তির কারণ। পুরুষই পুমান, পুরুষই চেতন এবং পুরুষই আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণ। যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী তাহারই নাম মন। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। মনের অতিযোগ, হীন যোগ ও মিথ্যা যোগ—প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণ। ইন্দ্রিয় ও মন অনুপহত রাখিতে না পারিলেই রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। দেহীগণ যখন ইন্দ্রিয় ও মন অনুপহত রাখিতে সমর্থ হইল না, তখনই বিশ্বসংসারে রোগ-রাক্ষসগণ প্রাদুর্ভূত হইল। ইহার ফলে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন,ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তখন জীবদিগের প্রতি দয়া বশতঃ পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাঁহারা ধ্যান-নিরত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ইন্দ্রই এ বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা, অমরনাথই ইহার উপায় স্থির করিয়াছেন মহর্ষি ভরদ্বাজ এই জন্য ইন্দ্র সমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিলেন এবং তাহা অন্যান্য ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন; ইহাই হইল আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র।

বিশ্ব সংসারে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের অন্য

অধ্যায়ে আমরা জানিতে পারি, যে, ধন্বন্তরিও এই পরম কল্যাণকর লোক হিতৈষিণী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া পুণ্যভূমি বারাণসী ধামে দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এই বিদ্যা জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মহর্ষি মিত্রের পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিঞ্চিদধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে পারা যায়। ভরদ্বাজ প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় দ্রব্য বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকটিত, কিন্তু সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা কেবল দ্রব্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া শারীর স্থানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শস্ত্র কর্ম্মের উপদেশ লইয়া বর্ণিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল চরক সংহিতা এবং মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল সুশ্রুত সংহিতা। চরকের চিকিৎসা এক কথায় বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লিখিত। অত্র চিকিৎসা সাপেক্ষ রোগদিগের সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই বলিব না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগকেও বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অতি সহজে তাহাদিগের চিকিৎসার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

চরক সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায় তিন শ্রেণীর জন্য লিখিত। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, মধ্যম বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি। কোনও রোগের স্বভাব উষ্ণ, উহার চিকিৎসা এজন্য তদনুরূপ হওয়া উচিত— উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদিগের জন্য এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। মধ্যম বুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার জন্য আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—ঐ রোগের চিকিৎসায় তিক্তকগণ আবশ্যক, কারণ তিক্তকগণ শীতল। তাহার পর অধম বুদ্ধিদিগের জন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে—ঐ রোগের চিকিৎসায় নিমছাল,বাসক ও গুলঞ্চ প্রভৃতির পাচন প্রয়োগ করিতে হয়, এ স্থলে এই তিন প্রকার কথার অর্থই যে এক, ইহা বুঝিতে অধিক কষ্ট হইবার কথা নহে, কিন্তু যে স্থানে লিখিত আছে যে, শুক্র রোগ, প্রদর, রক্ত পিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক, কিম্বা যে স্থলে লিখিত আছে যে,পিত্তের ক্ষয় হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত শ্লেষ্মা যৎকালে প্রকৃতিস্থ বায়ুকে রোধ করে, তৎকালে শীতক, গৌরব ও জ্বর হয়—এরূপ সাঙ্কেতিক কথা মধ্যম বুদ্ধি বা অধম বুদ্ধির বোধগম্য হয় না ; এ সকল সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ উত্তম বুদ্ধির জন্য লিখিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরকের চিকিৎসা বায়ু, পিত্ত ও কফের শ্রেণীবিভাগ করিয়া লিখিত, এজন্য শুক্র রোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত, ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক—এরূপ সাঙ্কেতিক কথায় শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতি রোগে মানবের শারীরিক অবস্থা একই প্রকার হয়-এরূপ অর্থ করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না, উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তি ইহাই বিবেচনা করিয়া ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন —ইহাই চরক সংহিতার সঙ্কেত।

চরকের চিকিৎসায় শস্ত্র-চিকিৎসার উল্লেখ না থাকিলেও ফল মূলাশি আর্য্য ঋষি উহাতে রোগের নির্ণয়ের বিচার যেরূপ ভাবে করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কোনো শাস্ত্রে

নাই। আর্য্য ঋষি ঐ সনাতন গ্রন্থে জোর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যদি তোমার যকৃতে বিদ্রধি (abcess) হইয়া থাকে, তবে তোমার খাস হইতে থাকিবে, যদি তুমি তেজস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে রাশীকৃত চিনি থাকিলেও উহা তোমার মধুমেহ নহে, যদি তোমার জলোদর হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে জলপান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ রোগ জলোদর রূপে পরিণত হইবে না, এরূপ নিশ্চয়াত্মক কথা পৃথিবীর আর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। চরক বলিয়াছেন, ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার, আয়ুর্ব্বেদের সকল গ্রন্থ ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন। ক্ষয় রোগ সপ্তদশ প্রকার বা ক্ষয় রোগ উনবিংশ প্রকার—সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত আর কেহই এ কথা বলিতে পারিলেন না। ঋষি বলিয়াছেন, যদি তোমার রাজযক্ষ্মা হইয়া থাকে, তবে তোমার স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে কখন কখন বেদনা থাকিবে, হস্ত ও পদে দাহ থাকিবে এবং অষ্ট প্রহরই জর থাকিবে। যদি এই তিনটি লক্ষণের একটি লক্ষণ না থাকে; তবে তোমার মুখ দিয়া রাশীকৃত কফ ও রক্ত পূয উঠিলেও তোমার রাজযক্ষ্মা হয় নাই ইহা নিশ্চিত। হাঁচির বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, বমির বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়—এ সকল কথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে শারীর তত্ত্বের জ্ঞান অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-দর্শন অন্যদিকে অগ্রসর হইলেও এ সকল কথার ব্যাখ্যার অভিমুখে তত দূর অগ্রসর হয় নাই। হাঁচি কিরূপে হয়, বমি কিরূপে হয়, নিশ্বাস-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, শ্লেষ্মবহ স্রোত সকলের ক্রিয়া কি—এ সকল কথা ডাক্তারি শারীর তত্ত্বে সুন্দর রূপে লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার সহিত চরকীয় ব্যাখ্যার সমাধান হইতেই পারে না।

কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে ইহাই চরক সংহিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। অমর-নাথ ইন্দ্রের নিকট এই জন্যই মহাতপা ঋষি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—

"দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্।"

কারণ ও কার্য্যের পরিভাষা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধাতুর সাম্য বা অরোগিতার বিচার করিয়া চরক সংহিতা রচিত। চরকের মতে ইহাই চিকিৎসার প্রধান সূত্র। এই সূত্র বুঝিতে হইলে দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার থাকা চাই, চরকের সূত্র স্থান সেই "ষড় দর্শনের" মীমাংসায় প্রকটিত।

চরক বলিয়াছেন, যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকেই মন বলে। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতিঃ, আকাশ, ক্ষিতি, জল ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান যথাক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, জিহ্বা ও ত্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা বোধ যথাক্রমে দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ,

ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই তত্তৎ বোধের উদয় হয়। সেই বুদ্ধি ক্ষণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ। মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা —এই কয়টিই শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত, এজন্য ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ মহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে ও বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে বিদ্যমান। যে ইন্দ্রিয় যে মহা ভূতে নির্ম্মিত, সেই ইন্দ্রিয় তদভাবাপন্ন বলিয়া সেই মহাভূতো-করণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হইলেই মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। এক কথায় রোগ ইহারই নামান্তর। দেহীদিগের শরীরে এইরূপ ভাবে যাহাতে রোগাক্রমণ না ঘটিতে পারে—মহর্ষি চরক গ্রন্থারম্ভে তাহারই জন্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"অসাত্ম্য বিষয় পরিহারপূর্ব্বক সাত্ম্য বিষয়ের অনুসরণ করিবে, সমীক্ষ্যকারিতা সহকারে দেশ,কাল ও আত্মার অবিরুদ্ধ ব্যবহার করিবে, সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে মন স্থির রাখিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল কার্য্য করিলেই যুগপৎ আরোগ্য লাভ ও ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইবে। চরকীয় চিকিৎসার ইহাই হইল মুখ্য অভিপ্রায়। চরকের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহারই চিকিৎসা বৃত্তি সার্থক। রোগ হইলে রোগ প্রতিকারক উপায় করিবে—ইহা তো সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণীজগতে যাহাতে রোগের আক্রমণ না হইতে পারে—চরক সংহিতার প্রারম্ভ ভাগে তাহাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত। জগদ্বাসী সে ঘোষণা শুনিয়া যখন স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে জানিত, তখনই মানবের পরমায়ু কাল সম্পূর্ণ হইত এক শত বৎসরে। এখনকার লোকের গড়ে পরমায়ুর সংখ্যা দাঁড়াইছে ৫০। চরক বলেন, প্রতি এক শত বৎসরে মানুষের জীবন এক বৎসর করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে এক শত বৎসর পরমায়ু ৫০।৬০ বৎসরে কমিয়া আসিতে কত বৎসর লাগে—ত্রৈরাশিকের নিয়মে তাহা স্থির করিলে চরকের প্রাদুর্ভাব কালের সময়-নির্দ্দেশ সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধি সময়ে অনুমান করিতে পারা যায়। চরকে সত্য ও ত্রেতা যুগের উল্লেখও আছে। যাহা হউক তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালের নির্দ্দেশ করণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে কথা লইয়া এখন মাথা ঘামাইবারও আবশ্যকা বিবেচনা করিতেছি না।

চরক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশে যে সকল সদবৃত্তের কথা বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যদি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে রোগ-যন্ত্রণা পাইতে হয় না, নীরোগ ও সুস্থ দেহে তাহার যে দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে—তাহা সুনিশ্চিত। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর সারমর্ম্ম—"দেব, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য দিগকে অর্চ্চন করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ ও সায়াহ্ন—দুইকালে জল দ্বারা আচমন করিবে। সর্ব্বদা মলায়ন ও পাদদ্বয়ের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবে। এক পক্ষের মধ্যে তিন বার কেশ, শ্মশ্রু, লোম

ও নখ ছেদন করিবে। সর্ব্বদা অচ্ছিন্ন বস্ত্র ধারী, প্রসন্ন মনাঃ ও সুগন্ধ ধারী হইবে। সাধু বেশ ও শোভিতকেশ হইবে। মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদ নিত্য তৈল দ্বারা ম্রক্ষণ করিবে। শাস্ত্রোক্ত ধূমপান করিবে। আগন্তুককে তুমিই অগ্রে সম্ভাষণ করিবে, মিষ্টমুখ হইবে। বিপন্নকে আশ্বাস দিবে। অতিথিদিগের পূজা করিবে। পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। সময় বুঝিয়া হিতকর অথচ পরিমিত ও মধুরার্থ যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিবে। সংযতাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা হইবে। যে কারণে যাহার উন্নতি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে। কিন্তু সেই কারণের ফলের প্রতি ঈর্ষা করিবে না। নিশ্চিন্ত নির্ভীক, লজ্জাশীল, বিমৃষ্যকারী, উৎসাহী, দক্ষ, ক্ষমাবান, ধার্ম্মিক ও আস্তিক হইবে। বিনয়, বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের উৎকর্ষ আছে, যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য—তাঁহাদের উপাসনা করিবে। ছত্র, দণ্ড, উষ্ণীষ ও উপানহ ধারণ করিবে। চলিবার সময় সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা মঙ্গলাচরণ করিবে। কুৎসিত বস্ত্র, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র কেশ, তুষ, জঞ্জাল, ভস্ম ও কপাল সমূহের নিকট দিয়া যাইবে না। বাসস্থান সকল পরিষ্কার করিবে। শ্রান্তি বোধ না হইবার পূর্ব্বেই শ্রম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবে। ক্রুদ্ধদিগকে অনুনয়ও ও ভীতদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবে। দরিদ্রদিগকে অনুগ্রহ করিবে। সত্যসন্ধ হইবে এবং চতুর্গুণের মধ্যে সামগুণ প্রধানরূপে অবলম্বন করিবে। পরের পরুষ বাক্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে, কিন্তু নিজে পরুষ হইবে না। প্রশস্ত গুণসমূহের উৎসাহ দাতা হইবে। রাগ ও দ্বেষের যাহা কারণ—তাহা পরিহার করিবে। অসত্য কহিবে না। পরস্ব গ্রহণ করিবে না। অন্য স্ত্রী অভিলাষ করিবে না। পরশ্রী কাতর হইবে না। বৈরীভাবের কল্পনা করিবে না। পাপ করিবে না। অপকারীরও অপকার করিবে না। পরদোষ কহিবে না। পরের রহস্য প্রকাশ করিবে না। অধার্ম্মিক বা রাজ-বিদ্বিষ্টদিগের সহিত বাস করিবে না। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহন্তা, ক্ষুদ্র ও দুষ্ট লোকদিগের সহিত বাস করিবে না। দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না। কষ্টকর আসনে বসিবে না। অনাস্তীর্ণ, উপাধানহীন, অপ্রশস্ত বা অসম শয়নে শয়ন করিবে না। গিরি গহনে বা গিরি শিরে বিচরণ করিবে না। বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। উগ্রস্রোতঃ জলে অবগাহন করিবে না। কুলগাছের ছায়া সেবন করিবে না। অগ্ন্যুৎপাতের সন্নিধানে বিচরণ করিবে না। উচ্চহাস্য করিবে না। লোকের সম্মুখে সশব্দ বায়ু নিঃসরণ করিবে না। মুখ না ঢাকিয়া, জৃম্ভন, ক্ষবথু কিম্বা হাস্য করিবে না। নাক খুটিবে না। দন্ত বিঘট্টিত করিবে না। নখ বাজাইবে না। অস্থিতে অভিঘাত করিবে না। ভূমি বিখিলন করিবে না। বৃক্ষ বা তৃণ ছিঁড়িবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কুৎসিতভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। উজ্জ্বল জ্যোতিঃ পদার্থের প্রতি বা অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। রাত্রিতে দেবালয়, চৈত্য, চত্বর, চতুষ্পথ, উপবন,

শ্মশান ও বধ্যভূমি সেবা করিবে না। শূন্য গৃহে বা অটবীতে একাকী প্রবেশ করিবে না। পাপাচার স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে ভজনা করিবে না। উত্তমদিগের সহিত বিরোধ করিবে না। নিকৃষ্টদিগের উপাসনা করিবে না। বক্র রুচির অনুসরণ করিবে না। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি পান ও অতি ভোজন করিবে না। উর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। সর্প, দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুর নিকট থাকিবে না। পূর্ব্ব বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র, হিম ও অতি বায় পরিহার করিবে। কলহ করিবে না। শ্রান্তি ও ঘর্ম্মের নিবৃত্তি না হইলে স্নান করিবে না। অকাচা কাপড়ে মাথা মুছিবে না। অকাচা কাপড় পরিধান করিবে না। রত্ন, ঘৃত, পূজা দ্রব্য, মাঙ্গল্য দ্রব্য ও পুষ্প স্পর্শ না করিয়া বাহির হইবে না। হস্তে রত্ন ধারণ না করিয়া, অস্নাত হইয়া,বস্ত্রত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবতা-দিগকে নিবেদন না করিয়া, পিতৃ, গুরু ও উপাসিতদিগকে দান না করিয়া, পবিত্র গন্ধ দ্রব্য ও মাল্য পরিধান না করিয়া, পাণি, পাদ ও বদন প্রক্ষালন না করিয়া, শুদ্ধ মুখ ও উত্তর মুখ না হইয়া ভক্ষণ করিবে না। অপমানিত, অভক্ত, অশিষ্ট, অশুচি ও ক্ষুধিত পরিচরের সমীপস্থ হইয়া, অমেধ্য ভোজন পাত্রে, অকালে, অস্থানে, আপন প্রভৃতি জনপূর্ণ স্থানে ভোজন করিবে না। অগ্নিকে ভোজ-নাগ্রভাগ না দিয়া, অন্নকে প্রোক্ষণ জলদ্বারা প্রোক্ষিত ও মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত না করিয়া ভোজন করিবে না। শত্রুর আনীত অন্ন ভোজন করিবে না। শুষ্ক বা বাসি অন্ন ভোজন করিবে না। রাত্রে দধি ভোজন করিবে না। দিবসে কেবল ছাতু খাইয়া থাকিবে না। রাত্রে ছাতু খাইবে না। ভোজনের পর ছাতু খাইবে না। দন্তদ্বারা চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করিবে না। শরীর বক্র ভাবে রাখিয়া হাঁচিবে না, ভোজন করিবে না বা শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ হইলে উহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। পথে প্রস্রাব করিবে না। রজস্বলা, আতুরা, অপবিত্রা ও অন্যকামা স্ত্রীতে গমন করিবে না। পরস্ত্রীতে গমন করিবে না। প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে স্ত্রীগমন করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশ হইবে না। চঞ্চল মনকে অধিক চঞ্চল করিবে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দিগকে অধিক ভারগ্রস্ত করিবে না। অত্যন্ত দীর্ঘ সূত্রী হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষ হইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবে না। ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান, দান, মৈত্রী, কারুণ্য ও হর্ষোৎ-পাদন দ্বারা শান্তিপরায়ণ হইবে।" ইহা ভিন্ন চরকে সদবৃত্ত অধ্যায়ে আরও অনেক উপদেশ বর্ণিত আছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে যে গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়— তাহাই সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

এই উপদেশের পরে ত্রিবিধ এষণার উপদেশ। এষণা শব্দের অর্থ চেষ্টা বা অম্বেষণ। পুরুষের উচিত যে, মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখেন এবং ইহ-পরলোকে মঙ্গলার্থী হইয়া তিনটি এষণার অনুসরণ করেন। ঐ তিনটি এষণার নাম প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পারলোকৈষণা। ইহার মধ্যে প্রাণৈষণা বা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে অনুসরণীয়। এই জন্য সুস্থ ব্যক্তির

উচিত স্বাস্থ্যের অনুপালন করা এবং পীড়িতের উচিত পীড়ার শান্তিবিধান করা। ইহার পরই দ্বিতীয় এষণা বা ধনৈষণার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয় ও দীর্ঘায়ু লাভ ঘটে না। তাহার পর তৃতীয় এষণা বা পারলৌকৈষণার অনুসরণ করিতে হয়। ইহলোক হইতে চ্যুত হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে উৎপন্ন হইব কিম্বা উৎপন্ন হইব কিনা এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তির দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম ও আত্মার সমবায় হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, এবং আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তা ও কারণ—এই উভয়ের যোগেই ক্রিয়া হয়। কৃতকর্ম্মের ফল আছে, অকৃত কর্ম্মের ফল নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। এজন্য পরজন্ম স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। পরজন্ম স্বীকার করিতে হইলে ধর্ম্মবুদ্ধি পরায়ণ হইতেই হইবে। পারলৌকৈষণা তাহারই জন্য অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চরকের এই তিনটি এষণা যিনি অনুসরণ করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন।

চরক বলিয়াছেন,—আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয় দমন - এই তিনটি শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটি উপস্তম্ভ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ু শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল-বর্ণের উপচয় হয়। এই কারণের অহিত ব্যবহারই রোগ। এই রোগ আবার সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, নিজ, আগন্তু ও মানস। যে সকল রোগ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহারা নিজ রোগ মধ্যে গণ্য। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহারা আগন্তু রোগ। আর প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম হইতে মানস রোগ উৎপন্ন হয়। রোগস্থান বা রোগ মার্গ তিন প্রকার, শাখা, মর্ম্মাস্থি সন্ধি ও কোষ্ঠ। শাখা শব্দের অর্থ রক্তাদি সপ্তধাতু ও ত্বক। ইহারাই রোগের বাহ্য মার্গ। বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকল এবং অস্থি সন্ধি, অস্থি সংযোগ সমূহ মধ্যম রোগ মার্গ। কোষ্ঠের অন্যান্য নাম মহা স্রোতঃ, শরীর মধ্য, মহা নিম্ন ও আম পক্কাশয়। ইহাই হইল আভ্যন্তরিক রোগমার্গ। গলগণ্ড, পীড়কা, অপচী, চর্ম্মকীল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, অলসক, কুষ্ঠ রোগ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি বাহ্য রোগ—বাহ্য মার্গজাত। বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ,বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ শাখানুসারী। পক্ষাঘাত, অঙ্গগ্রহ, অপতানক, অর্দ্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা অস্থি শূল, সন্ধি শূল, গুদ ভ্রংশাদি রোগ এবং শিরোগত, হৃদগত ও বস্তিগত রোগাদি মধ্যম মার্গানুসারী। জ্বরাতিসার, বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস কাস, হিক্কা, আনাহ, উদর, ও প্লীহাদি রোগ এবং অন্তর্মার্গজাত বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ ও বিদ্রধি প্রভৃতিকেও কোষ্ঠ মার্গানুসারী রোগ বলা যায়। ইহাদের চিকিৎসার জন্য চরক ৩ প্রকার ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন—দৈব ব্যপাশ্রয়, যুক্তি ব্যপাশ্রয় ও সত্ত্ববিজয়। মন্ত্র, ওষধিধারণ, রত্ন ধারণ, মঙ্গলাচরণ এবং বলিপূজা-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্ত উপবা

স্বস্ত্যয়ন প্রণিপাত-তীর্থ যাত্রাদিকে দৈব ব্যপাশ্রয়, যুক্তি পূর্ব্বক পথ্য ও ঔষধ যোজনার নাম যুক্তি ব্যাপাশ্রয়, আর অহিত বিষয় হইতে মনকে সংযত করায় নাম বা শান্তির নাম সত্ব বিজয়। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে শরীরে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের প্রতিকারার্থ যে সকল ঔষধের প্রয়োজন তাহাও ত্রিবিধ। অন্তর্ম্মার্জ্জন, বহির্ম্মার্জ্জন ও শস্ত্র প্রণিধান। যে সকল ঔষধ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আহারজাত ব্যাধি সকলকে নষ্ট করে, তাহাদের নাম অন্তর্ম্মার্জ্জন, যে সকল ঔষধ স্পর্শনেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ; স্বেদ, প্রলেপ, পরিষেক ও উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সহ রোগ নষ্ট করে—তাহাদের নাম বহিঃ পরিমার্ম্মার্জ্জন। আর শস্ত্র দ্বারা ছেদন, ভেদন, বন্ধন, বিদারণ, লেখন, উৎপাটন, পৃচ্ছন, সীবন, এষণ এবং ক্ষার ও জলৌকাদিগকে শস্ত্র প্রণিধান কহে। চিকিৎসা কার্য্যে এই তিন প্রকার চিকিৎসাই প্রয়োজনীয়। চরকে শস্ত্রদ্বারা চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত না হইলেও ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষির গবেষণা এই সকল কথায় কিরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। ধীমান, বৈরাগ্যপরায়ণ কৃষ্ণাত্রেয় এষণা, উপস্তম্ভ, বল, কারণ, রোগ, রোগমার্গ, বৈদ্য এবং ঔষধ এই আটটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই উপর চিকিৎসায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বায়ু, পিত্ত, কফের বিচার নির্ণয়ই চরকের প্রধান চিকিৎসা। ইহাদিগের পরিচয়ে এক কথায় যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহারই নাম বায়ু। পিত্ত অল্প স্নেহযুক্ত, উষ্ণ, দাহকত্ব প্রভৃতি তীক্ষ্ণ গুণ যুক্ত, দ্রব, অম্ল সারক স্বভাব এবং কটু। শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, ও পিচ্ছিল। এই তিনটির বিকৃতি-বৈষম্যই সকল রোগের নিদান। ইহাদিগের মধ্যে আবার বায়ুই প্রধান, কারণ বায়ুর বিকৃতি ভিন্ন কোনো প্রকার ব্যাধিরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এক কথায় সকল প্রকার রোগকেই বাতব্যাধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব, উদরে শূল, তৃষ্ণা, উদগার বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ শোষ ও শ্বাস উপস্থিত হয়। এই সকল রোগের চিকিৎসা প্রথমতঃ রুক্ষ স্বেদ ও পরে স্নিগ্ধ স্বেদ। কারণ আমাশয় কফের স্থান, বায়ু উহাতে আগন্তু মাত্র। পক্কাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে অন্ত্র কুজন, শূল, আটোপ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পুরীষকৃচ্ছ্র, আনাহ, ত্রিক বেদনা এবং কর্ণ প্রভৃতির শক্তি লোপ হইয়া থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে মূত্র-বিষ্ঠার বিবন্ধ, ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল, হইয়া থাকে। আমাশয় গ্রহণী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয় উন্দুক ও ফুসফুস ইহাদিগের নাম কোষ্ঠ। ত্বকস্থ বায়ু কুপিত হইলে ত্বক, রুক্ষ, স্ফুটিত, সুপ্ত, কৃশ, কৃষ্ণ ও তোদ যুক্ত এবং আতত ও রক্তবর্ণ হয়। বায়ু রক্তগত হইলে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বৈবর্ণ, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে অরুংষি নামক ব্রণ সমূহের উদয় এবং ভোজনের পর শরীরের স্তব্ধতা হইয়া থাকে।

মাংস মেদোগত বায়ু কুপিত হইলে অঙ্গ সমূহের গুরুতা এবং দণ্ডাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতের বেদনার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা ভিন্ন অত্যন্ত শূল ও শ্রমবোধ হইয়া থাকে। মজ্জাগত ও অস্থিগত বায়ু কুপিত হইলে অস্থি ও পর্ব্ব সমূহের ভেদ, সন্ধিশূল, মাংস ও ক্ষয়, অনিদ্রা ও সতত বেদনা হয়। শুক্র সহ বায়ু কুপিত হইলে শুক্র ও গর্ভ শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হয় বা বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা শুক্র ও গর্ভ—উভয়েরই বিকার উপস্থিত করে। স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপে পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন হয়। ধনুষ্টঙ্কারও এইরূপ বায়ুর বিকৃতির ফল। শিরাগত বায়ুর প্রকোপে শরীরে অল্প বেদনাযুক্ত শোথ, শরীর শুষ্ক ও স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং শিরা সকল সুপ্ত ও তনু বা স্থূল হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলে বাত পূর্ণদৃতির ন্যায় স্পর্শ বিশিষ্ট শোথের উৎপত্তি সন্ধিগত বায়ুর প্রকোপের পরিণাম। আমবাত রোগ এইরূপ বায়ু বিকৃতির ফলে হইয়া থাকে। ফল কথা দেহে সকল প্রকার রোগের উপত্তির কারণই বায়ুর বিকৃতি। ধাতুক্ষয় হেতু বা মার্গরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহের সর্ব্ব স্রোতেরই অনুসরণ করিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছে। বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তকে বহন করিয়া স্রোতঃ সমূহের মধ্যে যখন আক্ষিপ্ত করে, তৎকালে বায়ুর সঞ্চারণ পথ পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক আবৃত হওয়াতে রসাদি ধাতু সকল শুষ্ক হইয়া রোগ সকল উৎপন্ন করে। যেমন ইহ জগতে বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র বিকৃত হইলে জগৎ পীড়িত ও অবিকৃত থাকিলে জগৎ ধারণ করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইলে দেহকে পীড়ন ও অবিকৃত থাকিলে দেহকে ধারণ করে। এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রধান আশ্রয় মানুষের বস্তি, হৃদয় ও মূর্দ্ধা। অতএব চরকের মতে চিকিৎসা করিতে হইলে স্থান সম্বন্ধ অগ্রে বুঝিতে হইবে। এই স্থান সম্বন্ধ বুঝিয়া সাধ্য ও অসাধ্য বিচারপূর্ব্বক যিনি চিকিৎসা করিতে সক্ষম তিনিই চিকিৎসা ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া থাকেন। সাধ্য ও অসাধ্যের বিচার বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও চিকিৎসা করা যায় না। বায়ু, পিত্ত ও কফ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরকে সাত্ম্য বলিয়া পরস্পরকে নষ্ট করে না। এ কথার প্রমাণ, সর্পবিষ অন্যের শরীরে প্রাণঘাতী হইলেও উহা সর্পের সাত্ম্য বলিয়া সর্পকে নষ্ট করে না। ফল কথা ধাতুর বৈষম্যই রোগ এবং সমধাতু দিগের স্থিরতা সম্পাদনের জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসা কুশল বৈদ্য ইহা বিবেচনা করিয়া রোগীর রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিবেন—ইহাই মহর্ষি পুনর্ব্বসুর সার উপদেশ।

চরকে সকল রোগের নাম ও লক্ষণ বলিয়া সকল রোগের বিশেষ বিবরণ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। যে সমস্ত রোগের কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হয় নাই—চিকিৎসক বায়ু, পিত্ত, কফের লক্ষণ দেখিয়া যুক্তি পূর্ব্বক সেই সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন, ইহাও পুনর্ব্বসুর উপদেশ। যথা

রোগা যে হপ্যত্র নোদিষ্টা বহুত্বান্নাম রূপতঃ।
তেষামপ্যেতদেব স্যাদ্দোষাদীন বীক্ষ্য ভেষজম॥

চরক চিকিঃস্থাঃ ১৯৬ শ্লোঃ

এই কথা বলিয়া চরক চিকিৎসার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—"মুখ হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত, নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মলদ্বার হইতে ঊর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত যে সকল রোগ আশ্রয় করে, সেই সকল আভ্যন্তর রোগকে ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র অথচ উত্তমরূপে হরণ করা যায়। শরীরের বাহ্য প্রদেশে যে সকল বীসর্প ও পিড়কাদি হয়, স্থান বুঝিয়া প্রলেপাদির প্রয়োগে তাহাদের বিশেষরূপ প্রশমন হইয়া থাকে, ইত্যাদি। চরকের চিকিৎসা স্থানে সকল রোগের উল্লেখ না থাকিলেও চরকের আদ্যন্ত পাঠ করিলে কোনো রোগের চিকিৎসাই চরকে বাদ পড়ে নাই বুঝিতে পারা যায়। ক্রিমি, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের নিদান ও ঔষধ বিমান স্থানের অষ্টমাধ্যায়ে, ভগন্দর, গণ্ডমালা, স্ফোটক, প্রভৃতি শোথোঽধ্যায়ে, শূল রোগের সংখ্যা প্রভৃতির নির্দ্দেশ গ্রহণী রোগাধিকারে এবং বাত ব্যাধির পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অম্লপিত্ত—চরকে গ্রহণীরোগের অন্তর্নিবিষ্ট। গর্ভিণী, বালক, প্রসূতি ও ধাত্রীর চিকিৎসা—শারীর স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত। হৃদ্রোগ মূত্রাঘাত এবং যে সকল শিরোরোগের কথা যথাস্থানে বিবৃত হয় নাই —তাহা বায়ু রোগ ও সিদ্ধি স্থানের নবম অধ্যায়ে উপদিষ্ট। সুতরাং চরকে সকল রোগের চিকিৎসাই যে বিবৃত হইয়াছে, তাহা উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুঝিতে কষ্ট হয় না। চরক বলিয়াছেন, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভেদে সকল রোগের চিকিৎসাই তিন প্রকার, অতএব চিকিৎসা স্থানে কোনো রোগের চিকিৎসা বিবৃত না থাকিলেও লক্ষণ দৃষ্টে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তারি এসিয়াটিক কলেরার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এসিয়াটিক কলেরার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বিসূচিকা। এই বিসূচিকার চিকিৎসা চরকে বর্ণিত হয় নাই—কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি যদি মিলাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চরকের মতে ইহার চিকিৎসা অতি সহজে করিতে পারা যায়। এসিয়াটিক কলেরায়—

১। বিষ্ঠার বর্ণ আমানির ন্যায় সাদা। চরকের মতে ইহা শ্লেষ্মার লক্ষণ।

২। হঠাৎ বলক্ষয়। চরকে ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৩। সর্ব্বাঙ্গ শীতল। চরকে ইহা বাত শ্লেষ্মাও পিত্তের লক্ষণ।

৪। খালধরা। ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৫। নাড়ী দমিয়া যাওয়া। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৬। অনবরত ও অসহ্য তৃষ্ণা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৭। অন্তর্দ্দাহ ও অঙ্গ বিক্ষেপ। বাত শ্লেষ্মা প্রকোপের লক্ষণ।

৮। শ্যাব বর্ণ।—বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৯। সর্ব্বাঙ্গে সূচীভেদবৎ বেদনা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

১০। শিরঃ শূল। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মা প্রকোপের লক্ষণ।

১১। চক্ষু মগ্ন। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

১২। স্বরভঙ্গ। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মার প্রকোপ।

করা উচিত। যাহাতে তাঁহাদেরও রীতিমত কোষ্ঠ সরল থাকে, এরূপ আহারাদি করিতে হইবে, এবং গোদুগ্ধ পান করিতে থাকিলে, ঐ দুগ্ধের সহিত একটু সরও বেশ করিয়া গুলিয়া খাওয়ান আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সদ্যঃ মল পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে পানের বোঁটা অথবা এক টুক্‌রা নরম সাবান সরু বাতির মত করিয়া কাটিয়া শিশুর মলদ্বারেপ্রবেশ করাইয়া দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

যে সকল শিশুর যকৃতের ক্রিয়ার দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে দশ পনের ফোঁটা করিয়া 'কালমেঘের' রস অথবা শিউলী পাতার রস, ফোঁটা কত মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শিশুর পেট-কামড়ান।

অনিয়মিত আহার বা অতিভোজন কিম্বা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ বা দূষিত মাতৃস্তন্য পান করিলে, অথবা পেটের মধ্যে কৃমি জন্মিলে কিম্বা রীতিমত মল পরিষ্কার না হইলে শিশুদিগের পেটে শূল বেদনা অর্থাৎ পেট কামড়াইতে থাকে। পেটে ব্যথা আরম্ভ হইলে শিশু পেটটাকে শক্ত করে ও হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করে, কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকে।

আহারের অনিয়মে পেটব্যথা আরম্ভ হইলে গোটাকত যোয়ান, একটা গোলমরিচ ও অতি সামান্য একটু সৈন্ধব লবণ বেশ করিয়া বাঁটিয়া জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অথবা ফোঁটা চার পাঁচ যোয়ানের আরক জল মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিলে তখনই পেটের ব্যথা ভাল হইয়া যায়, হজমও বেশ হয়।

আর যদি শিশুর ভাল দাস্ত না হওয়ার জন্য, অথবা একেবারে মল বদ্ধ থাকার জন্য পেট কামড়াইতে থাকে, তবে পেটে একটু গরম সর্ষপতৈল বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং একটু গরম ন্যাকড়া খুব গরম জলে ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া গরম গরম স্বেদ দিতে থাকিবে। এইরূপ করিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে।

অচিরজাত শিশুর মলবন্ধের জন্য পেট কামড়াইতে থাকিলে, একটা "মুক্তাবর্ষীর" পাতা রগড়াইয়া বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, অথবা পানের বোঁটায় একটু রেড়ির তৈল লাগাইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে—তখনই দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে; পেট ব্যথাও ভাল হইয়া যাইবে। সাবানের সরু বাতি দিয়া দাস্ত পরিষ্কারের কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ডাক্তারেরা এরূপ স্থলে গ্লিসিরিনের পিচকারী দিয়া 'বাহ্যে' করাইয়া থাকেন।

আর যদি পেটফাঁপার জন্য পেট কামড়াইতে থাকে, তবে শিশুর নাভির গর্ত্তটুকু বাদ দিয়া উহার চারিদিকে একটু চূণ লাগাইয়া দিবে; দেখিবে অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পেটের ফাঁপ চলিয়া গিয়াছে।

শিশুর উদরাময়।

শিশু সকল জন্মাবার পর হইতেই দুই হইতে পাঁচ ছয় বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে, উহা তাহাদের স্বাভাবিক। বেশী বেশী দাস্ত হইতে থাকিলে অসুখ বলিয়া জানিবে।

সকল শিশুরই ছেলেবেলায় পেটের অসুখ হইয়া থাকে। পেটের অসুখ হইলে স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে বিশেষ নিয়মে থাকিতে হয়। পেটের অসুখে যে সকল আহারাদি নিষিদ্ধ, সে সকল দ্রব্য জননীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহাতে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেন না জননীর মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ ও অনেক সময় শিশুর উদরাময়ের কারণ হইয়া থাকে।

সুস্থ শিশুগণ যে মলত্যাগ করে, তাহার রং হলদে এবং তাহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। যদি মল খুব তরল ও মলের বর্ণ সাদা, কাল, সবুজ বা ছানা ছানা মত, কিম্বা ডিম ডিম মত হয়, তবে তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে, পেট ফাঁপে, বমি করে ও শিশু খুব ছট্‌ফট্ করে বা ম্লান হইয়া যায়, তবে তাহার পেটের অসুখ বলিয়া জানিবে এবং শীঘ্রই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে।

স্তন্যপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে ও স্তনদুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তাহাতে কোন প্রকার দোষ আছে কি না। যদি কিছু দোষ থাকে, তবে (১) পূর্ব্বকথিত উপায় দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে এবং শিশুর আহারের জন্য পরিশুদ্ধ শটীচূর্ণ (২) অথব খুব ভাল একতোলা বালি একসের আন্দাজ জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে; যখন আধপোয়া আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া একটু একটু করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে থাকিবে এবং প্রতিবারে দু'চার ফোঁটা করিয়া চূণের জল তাহার সহিত মিশাইয়া দিবে; কিম্বা বালি সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য দু'টী যোয়ান একটু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া, যখন বালি সিদ্ধ করিবে, তখন উহাতে ছাড়িয়া দিবে এবং বালি হইয়া গেলে ঐ যোয়ানের পুঁটুলীটা উঠাইয়া লইবে। ইহাতে বালকের খাদ্য শীঘ্র পরিপাক হইবে এবং পেটের অসুখেরও বিশেষ উপকার হইবে।

যেসকল শিশু বিলাতি উপায়ে বোতলের দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, তাহাদের প্রায়ই পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়। কেন না বোতল ভাল করিয়া না ধুইয়া সেই বোতলে পুনরায় গরম দুধ পুরিলেই দুধ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ বিকৃত দুগ্ধ পানে অচিরে বালকের পেট ফাঁপা, বমি ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি দেখা যায়। সুতরাং বালককে প্রথম হইতেই বোতলের দুগ্ধ পান করাইতে অভ্যাস করান উচিত নয়। তদ্ভিন্ন শিশুদিগের জন্য যে সকল বিলাতী দুগ্ধ বা খাদ্য এদেশে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে, সে সকল যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে, একথাও দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাও সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। যখন সচরাচর দেখা যায় যে, আহারের দোষেই শিশুদিগের উদরাময় ঘটিয়া থাকে, তখন ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ শিশুদিগের আহারের জন্য

(১) স্তন্যদুষ্টি-প্রতীকার প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

(২) 'শটীফুড' বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম প্রদেশে পরিশুদ্ধ শটীচূর্ণ 'তীখুর' নামে পরিচিত।

প্রদান করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। অনেকেই 'বিলাতি ফুড' নাম শুনিলেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন এবং ভালমন্দ বিচার না করিয়াই শিশুদের ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রায়ই অনুকুল হয় না। সেজন্য বিলাতী খাদ্যভোজী শিশু-গণের যকৃতের দোষ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত যত অধিক দেখা যায়, তত রোগের বাহুল্য বা অকালমৃত্যু এদেশীয় গোদুগ্ধপায়ী শিশুগণের দেখা যায় না। খাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যাও পল্লীশিশুর মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া আমাদের ধারণা। এখনও পল্লীগ্রামে মাতৃস্তনে দুগ্ধের অল্পতা হইলে গৃহস্থগণ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরে মাতৃস্তনে প্রভূত দুগ্ধ থাকিলেও যখন সে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বিলাতী বিশুদ্ধ কৃত্রিম দুগ্ধ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই শিশুকে পান করান হইয়া থাকে, তখন দুগ্ধের অভাব হইলে তো কথাই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুদিগের আহার সম্বন্ধে জননী বা ধাত্রীকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তান স্তনদুগ্ধ পান করিবে, ততদিন জননী বা ধাত্রীর অনুচিত আহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং স্তনপায়ী শিশুর অজীর্ণ বা উদরাময় দেখা দিলে জননীকেও আহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। যে সকল শিশু গোদুগ্ধ পান করে, তাহাদের গোদুগ্ধ বন্ধ করিয়া শটী বা বার্লি প্রভৃতি দিতে হইবে, এবং শিশুকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বিবেচনা করিলে বার্লি বা শটীর সহিত অল্প পরিমাণে দুধ মিশাইয়া দিতে পারা যায়।

অতঃপর আমরা উদরাময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সকল প্রকাশ করিতেছি।

উদরাময়।

সদ্যোজাত শিশু প্রথমে মায়ের স্তনদুগ্ধ খাইয়া যে দিনে চার পাঁচ বার কি ছয়বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে তাহাকে সাধারণতঃ পেটের অসুখ বলা হয় না। কেন না তখন পাঁচ ছয় বার মলত্যাগই স্বাভাবিক। যদি তাহার বেশী মল হয়, পেট কামড়ায়, সে জন্য শিশু প্রায়ই কাঁদিতে থাকে অথবা পেট ফাঁপে, কখন কখন বা দুধ খাইয়াই ছানা ছানা বমি করিয়া ফেলে। শাদা শাদা কিংবা সবুজ সবুজ অথবা নানা রঙের বহুবার মলত্যাগ করে ও শিশুর মুখ চোক বসিয়া যায় বা ম্লান হয়, তবেই শিশুর উদরাময় হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

উদরাময় হইলেই শিশুর আহারের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেহেতু আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। এজন্য স্তন্যপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তন্যদাত্রী জননী অথবা ধাত্রীর আহার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিতে বলিবে, এবং যাহাতে তাঁহাদের মানসিক কোনও প্রকার অশান্তি বা চিন্তা প্রভৃতি না জাগে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শোক, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন প্রভৃতি নানাবিধ অহিতকর আচরণের দ্বারা জননীগণের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং সেজন্য তাঁহাদের স্তনদুগ্ধও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই বিকৃত দুগ্ধপান করিলে শিশুরও উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও সর্ব্বপ্রথমে স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীর স্বাস্থ্য কিরূপ আছে দেখিতে হইবে এবং আবশ্যক মত তাঁহাদের আহারাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল সন্তান বেশীর ভাগ গোদুগ্ধ অথবা বিলাতী খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের যদি পেটের অসুখ দেখা যায়, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ গোদুগ্ধ বা বিলাতী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময়ে বিলাতী খাদ্য বা টিনের দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতেই শিশুর উদরাময়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ সব সময়েই যে অবিকৃত অবস্থায় এদেশে আসিয়া থাকে, এমন তো মনে হয় না।

যে সকল বালকের গোদুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের পেটের অসুখ হইলে, গোদুগ্ধের দ্বিগুণ জল ও দুগ্ধ এবং তাহাতে একটুকরা বেলশুঁঠ (কচিবেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া লইলেই বেলশুঁঠ হয়) আর গোটাকত যোয়ান ন্যাকড়াতে বাঁধিয়া সবগুলি সিদ্ধ করিতে দিবে এবং খানিকটা জল থাকিতেই দুগ্ধটা নামাইয়া লইয়া বেলশুঁঠ ও যোয়ান তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। সেই দুধ একটু বার্লি, সাগু বা শটীর পালোর সহিত মিশাইয়া বারে বেশী ও মাত্রায় কম করিয়া খাইতে দিলেই আহারের জন্য আর শিশুর কোন প্রকার পেটের অসুখ হইবার ভয় থাকিবে না।

উদরাময়ের চিকিৎসা।

বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পান করাতে যে সকল শিশুর পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং শরীরও একটু জর জর বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে,—

১। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৵৹ দুই আনা পরিমাণে লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া শীলে ছেঁচিবে এবং একটী মাটির পাত্রে আধপোয়া জল দিয়া কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিবে। যখন জল মরিয়া আধছটাক আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারে অথবা দুই তিন বারে শিশুকে পান করাইয়া দিবে। অথবা,—

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল বৃহতী, কণ্টকারী চাকুলে ও শুলফা এই সকলের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশাইবে এবং তিন রতি হইতে ছয় রতি মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া বালককে খাওয়াইবে। যে সকল শিশু বহুদিন হইতে পেটের অসুখে কষ্ট পাইতেছে, শরীর খুব দুর্ব্বল ও কিছুই খাইতে চায় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

১৩। শ্বাস। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মার প্রকোপ।

১৪। মূত্রাঘাত। বায়ু জন্য।

১৫। আধ্মান। বায়ু জন্য।

১৬। তন্দ্রা। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মা জন্য।

এজন্য স্থির করা যাইতে পারে, এই রোগ বাত শ্লেষ্মাল্বণ ও ক্ষীণ পিত্ত সন্নিপাত। অতএব তাপ ও স্বেদাদি এবং দশমূলাদি উহার ঔষধ। সকল রোগের চিকিৎসাই এই রূপ লক্ষণ মিলাইয়া করা যাইতে পারে। ফল কথা চরকের চিকিৎসা অপূর্ব্ব চিকিৎসা। এ চিকিৎসার তুলনা নাই। জগতের কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রই চরকের সমকক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন অমূল্য চিকিৎসা এখন লুপ্তপ্রায়। ভারতবাসীর দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়,অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু চরকের চিকিৎসারই লুপ্ত ভাবের জন্য,—ডাক্তার ওয়াইজ এবং আমেরিকাবাসী ইংরাজেরা পর্য্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই আমরা এ কথা বুঝিতেছি না, তাই আমরা মহামূল্য রত্ন ভ্রমে আজ কাচের আদর করিতে শিখিয়াছি। এক কথায় আমাদের দুর্গতি—আমাদের মরণের পথ আমরাই যে পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছি—ইহাই খাঁটি সত্য কথা। ইহার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

শিশু-চর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

চোক উঠা।

প্রসবের পরেই অথবা কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা বা ধোঁয়া প্রভৃতি লাগিয়া অনেক শিশুর চোক উঠিতে দেখা যায়। চোক উঠিলে, চোক ফোলে,লাল হয়, পিচুটী কাটে, জল পড়ে, চোক জুড়িয়া যায়। সেজন্য শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, চোকের যন্ত্রণায় সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে ও আলোর দিকে তাকাইতে পারে না।

অনেক স্থলে রমণীর কুচরিত্র স্বামীসহবাসে বিষমেহ (গণোরিয়া) প্রভৃতি, দুষ্টরোগ হইতে দেখা যায়। যদি ঐ দুষ্ট রোগের জন্য প্রসবকালে শোণিত-পূযাদি স্রাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ দূষিত দ্রব্য সংযোগে চোক উঠার মত হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ যত্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না করাইলে বালকের চোক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন,—

সাধারণ চোক উঠা হইলে,—আমলা, হরীতকী ও বহেড়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে উহা বেশ করিয়া দুই তিন পুরু কাপড়ে ছাকিয়া সেই জল দ্বারা বালকের চোক দু'টী ভাল করিয়া আস্তে আস্তে ধুইয়া দিবে এবং ঐ ত্রিফলার জল এক ছটাক আন্দাজ লইয়া তাহাতে একরতি আন্দাজ ফিট্‌কিরি মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখিবে, এবং মাঝে মাঝে ঐ জল তিন চা'র ফোটা বালকের চোকের ভিতর দিবে। আর মনসাসিজের পাতায় কাজল করিয়া বালককে কাজল পরাইয়া দিবে, এবং রক্তচন্দন ঘষিয়া বালকের চোকের উপর চারিদিকে প্রলেপ দিবে। অথবা,—দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটি ছাগলের দুধে বেশ চন্দনের মত করিয়া ঘষিয়া চোকের উপর প্রলেপ দিবে। আর যদি চোক বেশী বেশী ফোলা বলিয়া মনে হয়, তবে একখানা আল্‌তা স্তনের দুধে ভিজাইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিয়া ধীরে ধীরে চোকের উপরে স্বেদ দিবে। এইরূপ দিনকতক করিলেই চোক উঠা সারিয়া যাইবে। আর যদি এই কল ব্যবস্থায় বিশেষ কোন ফল না হয়, দিন দিন চোকের অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়া চিকিৎসা করাইবে; নচেৎ পরিণামে বালকের চক্ষু দুইটী জন্মের মত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

সদ্যোজাত শিশুর ঘন ঘন প্রস্রাব করা স্বাভাবিক। অতএব শিশু একেবারে প্রস্রাব না করিলে অথবা ফোটা ফোটা প্রস্রাব করিতে থাকিলে, তাহাকে রোগ বলিয়া জানিবে।

যদি শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পেট ফুলিয়া উঠে এবং তলপেটে মূত্রাশয়ে চাপ দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। তা' ছাড়া, প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যাওয়াতে শিশু অত্যন্ত অস্থির হয়, পা দুইটা গুটাইয়া পেটের কাছে রাখে ও সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে, ঘুমাইতে পারে না, কেবল কোঁথায় এবং সেজন্য কখন কখনও শিশুর জ্বরভাব হইতেও দেখা যায়।

যদি দেখা যায় বালকের মূত্রাশয়ে মূত্র জমিয়া রহিয়াছে অথচ প্রস্রাব হইতেছে না, তাহা হইলে, এক টুক্‌রা কাপড় (গরম কাপড়ের হইলেই ভাল হয়) গরম জলে ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া তলপেটে মূত্রাশয়ের উপর সেক দিতে থাকিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে। অথবা,—একটা গাম্‌লায় বালকের সহ্যমত অল্প গরম জলে বালকের কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া দিবে তাহাতে প্রস্রাব হইবে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য।

সদ্যোজাত শিশুর দিনে পাঁচ ছয়বার দাস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি শিশু দিনান্তে একবার কি দুইবার অথবা একদিন অন্তর শক্ত শক্ত বাহ্যে যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিকার করা উচিত। নচেৎ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া শিশুর স্বাস্থ্য হানি করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ শিশুর জননী বা ধাত্রীর আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন

২। ধাইফল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে এবং আধ আনা হইতে এক আনা,—অথবা বালকের একটু বয়স হইলে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া চাটাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতেও বালকের পেটের অসুখ, বমি ও জ্বর প্রভৃতির বিশেষ উপকার হয়। শিশুর জ্বর না থাকিলেও এই ঔষধ দিতে পারা যায়। অথবা,—

৩। মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশাইবে এবং এক আনা মাত্রায়, দিনে তিন বার মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুকে লেহন করাইবে। ইহাতে জ্বরাতিসার অর্থাৎ জ্বরের সহিত পেটের অসুখ বমি ও কাসি প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। অথবা—

৪। আমড়ার ছাল, আমছাল ও জামছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় দিনে তিনবার অথবা দুইবার মধু দিয়া বালককে সেবন করাইলে শিশুদের পেটের অসুখ ভাল হইয়া থাকে। অথবা—

৫। যে সকল শিশু অনবরত ভেদ ও বমিতে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে,—

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল,—ইহাদের পাতা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া থাক।

শিশুর উদরাময়ের জননীর পথ্যাপথ্য।

যে সকল জননীর সন্তানের পেটের অসুখ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যদি ঐ পীড়িত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন—

পথ্য—প্রাতে দেড় প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ দশটা আন্দাজ সময়ের মধ্যে,—পুরাতন চালের বেশ সুসিদ্ধ ভাত, মসূরীরদাল অথবা কৈ-মাগুর মাছের ঝোল এবং পটোল কচি-বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর ও মোচা প্রভৃতির তরকারী খাইতে পারিবেন। মাছের ঝোলের সঙ্গে গোটাকতক গন্ধভাদুলের পাতা বাটিয়া দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে ঘোলও খাইতে পারেন। আর রাত্রিতে,—শটীর পালো, বার্লি, যবের মণ্ড কিংবা পানিফলের পালো খাইবেন। জলখাবারের মধ্যে,—সকালে মিছরীর গুঁড়া দিয়া বেলপোড়া অথবা দাড়িম, কেশুর ও পানিফল এবং বৈকালে বেলের মোরব্বা।

অপথ্য—ঘৃতপক্ক ও গুরুপাকদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল অধিক জলপান, গম, মাষকলায়, শাক, আকের গুড়, নারিকেল অধিক লবণাক্তদ্রব্য, গায়ে বেশী করিয়া তেল মাখা, রাত্রিজাগরণ 'পেটে' ও ভাজা পোড়া দ্রব্য, দুই বেলা স্নান বা গা ধোয়া প্রভৃতি।

যাঁহারা সন্তানের সুদীর্ঘজীবন ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য কামনা করেন, তাঁহারা ছেলের অসুখে নিজেদের কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কেহ যেন চিকিৎসক ও ধাত্রীর উপর শিশুর ভার দিয়া মাতৃকর্ত্তব্য হইতে নিশ্চিন্ত না হয়েন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস]

মেদা ও মহামেদা।

"মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লাদ্রকনিভঃ কন্দো লতা-জাতঃ সুপা-ভুবঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদা লক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দোনখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদিতি বিজ্ঞেয়া জিজ্ঞাসা তৎ পরৈর্জনৈঃ
স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতা-মণিঃ॥
মেদাযুগং গুরুস্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম।
বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্ত বাতজ্বর প্রণুৎ॥

গুণও আময়িক প্রয়োগ। মেদা ও মহামেদা গুরু স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধ-বর্দ্ধক,কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল এবং রক্ত-পিত্ত ও বাতজ্বর বিনাশক।

মেদা (Intestines) শব্দের অর্থ (Fat) ও মহামেদা শব্দও প্রায় একার্থ বোধক। আমাদের শরীরে Intestines হইতে চর্ব্বি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। Intestines এ যে সকল Villi আছে, তদ্দ্বারা চর্ব্বি প্রথমতঃ মর্দ্দিত (Enulsification) ও পরে Saponification হইয়া Portal System এ প্রবেশ করে ও তথা হইতে রক্তে মিশ্রিত হয়। Intestinal glands হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় (Succus) Entericus) আমরা খাদ্য দ্রব্যের সহিত যে সকল দূষিত দ্রব্য ভক্ষণ করি, সেই রস তৎসমুদায় বিনষ্ট করে।

মহামেদা (Liver)। আমাদের শরীরে যকৃৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। তদ্দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করি, তাহার সারাংশ প্রথমতঃ রসরূপে শরীরে প্রবেশ করে। সেই রস যকৃতের ভিতর দিয়া প্রবাহিত রক্তরূপে হৃৎপিণ্ডে যায়। এই যন্ত্রই রক্তের লাল কণিকা প্রস্তুতের সাহায্যকারী। এই যন্ত্র হইতে Urea প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই ureaই বাতজ্বরের প্রধান কারণ। পক্কাশয়ে (Intestines) আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের উপরি যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়,সেই ক্রিয়া যকৃতে শেষ হয়। সুতরাং Intestines ও Liver উভয়েই অনেকটা এক প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পক্কাশয়ের রস (Succus Entericus) যেরূপ অনেক বিষাক্ত দ্রব্য নষ্ট করে, পিত্ত ও তদ্রূপ অনেক দূষিত জিনিস নষ্ট করিয়া থাকে।

কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী।

জায়তে ক্ষীরকাকলী মহামেদোদ্ভব স্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীর কাকলী কাকোলী তত্র জায়তে
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে

যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা
ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিৎ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়-
মুভয়োরপি॥
কাকোলী বায়সোলী চ বীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণীধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র পিত্তশোষ জ্বরাপহম্॥"
দ্রব্যগুণম্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। ইহারা শীত-বীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর রস, গুরু ও পুষ্টি-কারক এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত শোষ ও জ্বর নাশক।

ক্ষীরকাকোলী ছেদন করিলে এক প্রকার আটা নির্গত হয় এবং ইহা এক প্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট।

ক্ষীরকাকোলী (Pancreas) পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Pancreas ঔষধ ও খাদ্য রূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা হইতে সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য Sweet bread প্রস্তুত হয়। এই রসের অভাব মধুমেহ (Diabetes) ব্যারামের কারণ বলিয়া অনেক পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যারামে ইহার রস (Trypsogen) ব্যবহারে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

কাকোলী (Spleen) ফিজিওলজী পাঠে জানা যায় যে, Splenic Internal Secretion Pancreatic Secretion এর সহিত মিলিত হইয়া একত্রে লিভারে যায় এবং এই Splenic Secretion Albuminoid জিনিসের বিষ হইতে শরীরকে রক্ষা করে। ইহা রক্তের শ্বেত কণিকা প্রস্তুতের সাহায্য করে। রক্তের এই শ্বেত কণিকাগুলি (white corpuscles) আমাদিগকে যে অনেক ব্যারামের হাত হইতে নিস্তার করে—ইহা ধ্রুব সত্য।

দ্রব্যগুণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেদা ও মহামেদা ক্ষেত্রে কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলীর উৎপত্তি। Spleen এবং Pancreas উভয়েই মেদা ও মহামেদা (Intestines ও Liver) ক্ষেত্রে প্রকৃতই উৎপত্তি হইয়াছে কারণ Spleeno-Pancreatic Duct Portal System গিয়া মিলিত হইয়াছে।

জীবন্তী।

আয়ুর্ব্বেদে জীবন্তী নামে কতকগুলি বস্তু বুঝায়। জীবন্তী এক প্রকার শাক বিশেষ। হরীতকী ও গুড়ূচী এই দুইটী দ্রব্যের জীবন্তী আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্য গুণে ইহার নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

"জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যনামধেয়া চ পাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
চক্ষুষ্যা গ্রাহিকা বল্যা লঘ্বী ধাতুবিবর্দ্ধিনী॥
বৃষ্যা কফকরী স্বতবর্দ্ধিনী রক্ত-পিত্তহা।
বাতং ক্ষয়ং জ্বরংদাহং নেত্র রোগং ত্রিদোষকম্॥
রক্তদোষং ভূত বাধং পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
ফলং চাস্যা ধাতু-বৃদ্ধিকারকং মধুরং গুরু॥"
দ্রব্যগুণ

"গুণও আময়িক প্রয়োগ। ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, বলকারক, লঘু,

ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, কফজনক,ও পারদবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা, পিত্ত, বাতজরোগ, ক্ষয়, জ্বর, দাহ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতবাধা ও পিত্ত দোষ নিবারিত হয়।"

জীবন্তী (kidney) যেরূপ জীবন্তী রক্তের দূষিত জিনিস নষ্ট করে, তদ্রূপ kindney Extract মূর্চ্ছা ও Urwmia প্রভৃতি রক্ত-দুষ্টি জনিত ব্যাধির উপশম করে। শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত করিবার জন্য মূত্রযন্ত্রের অত্যধিক চালনা জনিত Chronic Brights Disease প্রভৃতি যে সব ব্যাধির উৎপত্তি হয়, ইহার ব্যবহারে সেই সকলের উপশম হইয়া থাকে। ইহার (kidney) আস্বাদ সুস্বাদু, ইহাই জীবন্তী।

যষ্টীমধু।

"যষ্টীমধু তথা যষ্টিংমধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকং তত্তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা
যষ্টির্হিমা গুরুঃস্বাদী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা।"
শোষদাহারুচিঘ্নী চ কাসানাঞ্চ বিনাশয়েৎ।

যষ্টীমধু (Thymus gland) মনুষ্যের বাল্যজীবনে দ্রব্যগুণ Theymus gland এর ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অস্থিসমূহে Phosphorus প্রদান করিয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। ইহার অভাবে Rickets প্রভৃতি ব্যারামের উৎপত্তি হয়, Thyroid gland এর কার্য্যের অভাব উপস্থিত হইলে ইহা তাহার কার্য্য অনেক অংশে পূরণ করে। Rickets ব্যারামে শরীরের পুষ্টি হয় না যষ্টিমধুরও ক্ষয়নাশক গুণ আছে।

জীবনীয়গণের মধ্যে প্রথম আটটীকে অষ্টবর্গ বলে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ এই আটটীর মধ্যে দুইটী জিনিসের ক্রিয়া একরূপ, তদ্রূপ প্রাণীশরীরস্থিত ৮টী জিনিষের মধ্যে Adrenal ও Pituitary body, Thyroid ও ovary বা Tesicle, Spleen ও Pancreas, Intestines or Liver ২।২টী জিনিসের ক্রিয়া যে একরূপ ইহা উল্লিখিত হইল। যেরূপ জীবনীয়গণের মধ্যে জীবন্তী ও যষ্টীমধু এই দুইটীর পৃথক পৃথক্ বর্ণনা আছে, সেইরূপ প্রাণীশরীরস্থিত জিনিসগুলির মধ্যে Kidney ও Thymus এই দুইটীর পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনীয়গণের ক্রিয়া প্রধানতঃ ক্ষয় ও রক্তদুষ্টি নিবারক এবং অধিকাংশের ক্রিয়াই প্রায় একরূপ, বর্ণনায় সামান্যতঃ প্রভেদ আছে। প্রাণীশরীরস্থিত পদার্থগুলিরও ক্রিয়া রক্তদুষ্টি ও ক্ষয় নিবারক এবং উহাদের ক্রিয়ার বর্ণনায় ও বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। মনুষ্য শরীর পঞ্চভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা যে যে উপাদানে গঠিত, উদ্ভিদ জগতে সেই সেই জিনিস থাকা অসম্ভব নহে। আর্য্য ঋষি-গণ প্রধানতঃ হিমালয় ও তন্নিকটবর্ত্তী গহন কাননে বাস করিতেন। তাঁহারা ঔষধ সম্বন্ধে এত উন্নতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, মনুষ্য শরীরের যে যে অংশ যে যে উপাদানে নির্ম্মিত,সেই সেই উপাদান তাঁহারা উদ্ভিদ জগতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা সেই সমস্ত মহামূল্য বস্তু হারাইয়া নিশ্চেষ্ট আছি। সোমলতাও এইরূপ একটী অমূল্য

লুপ্ত ঔষধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল বাজারে অনেকেই সোমলতারিষ্ট প্রস্তুত করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে হইলে পুনশ্চ আমাদিগকে মহর্ষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। ইহা দেশের শিক্ষিত মহোদয়গণের উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।*

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত, এচ্, এম্, বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্বরে—

১৯। কট্কী, মুথা, যবতণ্ডুল, আকনাদি ও কট্ফল ইহাদের কাথ পিত্তজ্বরনাশক। এই ঔষধ আমরা বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

২০। গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া ও সেফালিকা পত্র—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র থেঁতো করিয়া কলার পত্রে জড়াইয়া, তাহার উপর অল্প মাটির লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহার রস করিয়া সেবনে বহুকাল জাত জ্বর আরোগ্য হয়।

২১। গুলঞ্চ, হেলেঞ্চা, পটোলপত্র, থানকুনি ও ক্ষেৎপাপড়া উপরি লিখিত প্রণালীতে সেবনে দুরারোগ্য যে বিষম জ্বর তাহাও ৭।৮ দিনে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দুইটী আমাদের বহু পরীক্ষিত। এই যোগ দুইটী বিষম জ্বরের অমোঘ ঔষধ।

২২। ভৃঙ্গরাজ মূলের সাতটী খণ্ড করিয়া, এক একটী খণ্ড এক টুক্‌রা আদার সহিত সেবন বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

২৩। পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ—বাতশ্লেষ্ম জ্বরনাশক।

২৪। মুথা, বাসক, গুলঞ্চ, শুঠ, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও দুরালভা ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন।

২৫। বেলছালের কাথ—বাতশ্লেষ্মা জ্বরে হিতকর।

২৬। বাকসছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ—ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয়। কাসেও ইহা সেবনে উপকার হয়।

২৭। ক্ষেৎপাপড়ার কাথ পান করিলে পিত্ত জ্বর নষ্ট হয়। পিত্তজ্বরে আমরা দুই তোলা ক্ষেৎপাপড়া—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন

---

* আমার পিতামহ ইটালির স্বনামধন্য কবিকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ পুঁথি হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

করাইতে উপদেশ দিয়া বেশ ফল পাইয়াছি।

হিক্কায়—

২৮। কুলের আঁটীর শাঁস, সৌবীরাঞ্জন, খৈচূর্ণ একত্রে মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা উপশমিত হয়।

২৯। শুঁঠ ও হরীতকী বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়।

৩০। যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

৩১। কাঁচা হরিদ্রার পত্র তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তামাকের ন্যায় ধূম পান করিলে প্রবল হিক্কায় উপকার দর্শে।

৩২। অর্জ্জুনছালের কাথ পান করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ছালের পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

৩৩। শালপানি ও বেড়েলার কাথ কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত সেবনে হৃদ্রোগের উপকার হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

রক্তগুল্মে—

৩৪। দুইতোলা আমলকীর রস এক-আনা মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে রক্তগুল্ম ভাল হয়।

বমন রোগে—

৩৫। শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত ও সিদ্ধির সহিত পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়।

৩৬। হরীতকী চূর্ণ মধুর দ্বারা লেহন করিলে বমন নিবারিত হয়।

স্বরভেদে—

৩৭। দারুচিনি, মূথা, এলাইচ্ ও ধনে ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়।

৩৮। ব্রাহ্মীশাকের রস কিঞ্চিৎ মধুসহ এবং বচ, হরীতকী, বাসক, পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনে স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। সাত আট দিন সেবনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমরা অনেক রোগীকে এই যোগ সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

৩৯। কৃষ্ণ তিল বাটা ২ তোলা পরিমাণ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে অর্শে উপকার হয়।

৪০। হরিদ্রা ও ঘোষালতা চূর্ণ সর্ষপ তৈল দ্বারা লেপন করিলে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

৪১। পিঁপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষ ফল এই সকল মনসা পাতার রস ও আকন্দের ক্ষীর দ্বারা গুদাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ আমরা ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি।

রক্তপিত্তে—

৪২। বাসক পাতার রস অর্দ্ধছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

৪৩। বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া -চিনি ও মধু সহ পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা আমরা কাসে, শ্বাসে ও রক্তপিত্তে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

৪৪। আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে

নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব বিনষ্ট হয়। ইহাও আমাদের বহু পরীক্ষিত।

যক্ষ্মায়—

৪৫। ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,) চূর্ণ সমভাগে দুই আনা মাত্রায় লইয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় লেপন করিলে যক্ষ্মা ভাল হয়। এই ঔষধ দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিতে হয়।

৪৬। গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ, পলতা ও বেল ছাল ইহাদের ক্বাথ সেবনে যক্ষ্মা রোগীর জ্বর ভাল হয়।

কাসে—

৪৭। কণ্টকারীর ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ সহ পান করিলে কাস নষ্ট হয়।

৪৮। পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্, বৃহতী ফল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে কাস নিবারিত হয়।

পাঁচড়ায়—

৪৯। তিল উত্তমরূপে বাটিয়া পাঁচড়ার মুখে প্রলেপ দিলে অল্পদিনের মধ্যে পাঁচড়া ভাল হয়।

৫০। থুল কুড়ির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর পাঁচড়া নষ্ট হয়।

চুলকণায়—

৫১। চালমুগরার তৈল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন গায়ে মর্দ্দন করিলে চুলকণা ভাল হয়।

ক্রিমিরোগে—

৫২। নিমপাতার রস কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৫৩। পলাশবীজ ১ তোলা, ৵৷৹ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

পরমায়ু প্রসঙ্গ

বা

মানুষ মরে কেন ?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনোদ, ধন্বন্তরি]

পূর্ব্বানুবৃত্তী।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির উপায়।

দীর্ঘ জীবন লাভ সম্বন্ধে বিজ্ঞ চাণক্য কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্
ঘৃত মুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্।

ইহার অর্থ এই-টাটকা মাংস। নূতন চাউলের অন্ন, তরুণী নারী, দুগ্ধ পান, ঘৃত ভোজন এবং উষ্ণোদক ব্যবহার, এই ছয়টিতে সদ্যঃই আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহানুভব চরক লিখিয়াছেনঃ—

গৌরসামিক্ষু বিকৃতীর্বসাং তৈলং নবোদনম্।
হেমন্তেহভ্যস্যতাস্তায় মুষ্ণঞ্চায়ুর্ন হীয়তে॥

ইহার অর্থ এইঃ—শীতকালে অধিক পরিমাণে গব্যদুগ্ধ, গুড়, মিছরি, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, এবং উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে কখনই আয়ু ক্ষয় হয় না।

তবেই আহার বিহারাদির নিয়ম পালনে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আয়ু ক্ষতিকর আহার বিহারাদিতে আয়ুর ক্ষয়, —ইহা তো সুনিশ্চিত প্রতিপন্ন হইল।

পূর্ব্বশ্লোকে মনীষি চাণক্য ঘৃত ভোজনকে সদ্যঃ প্রাণকর বলিয়াছেন। বাস্তবিক ঘৃতের তুল্য পরমায়ু বর্দ্ধক খাদ্য আর জগতে নাই। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থাৎ, যদি অর্থ না থাকে, তবু ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইবে। কারণ ঘৃত ভোজন দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে এবং ধর্ম্ম,অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

ঘৃত অমৃত তুল্য উপকারী। উহা দেবগণেরও পরম আদরের সামগ্রী। ঘৃত ভিন্ন কোন দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা যায় না। সুস্থ শরীরের আহারকালে নিত্য ঘৃত, দুগ্ধ না খাইলে, সেই আহার আহারই নহে। এই জন্য সুধী চাণক্য বলিয়াছেনঃ—

বস্ত্র না থাকিলে অর্থাৎ উলঙ্গ অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান হাস্যজনক। ঘৃত বিহীন ভোজন নিস্ফল। স্তনহীনা নারী কদাকার এবং বিদ্যাহীন জীবন মরুভূমিসদৃশ।

অতএব দেশীয়গণের খাদ্য দ্রব্য মধ্যে ঘৃত দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হবির অশেষ প্রকার গুণ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। মহাত্মা চরক লিখিয়াছেনঃ—

স্মৃতিবুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজঃ কফমেদো বিবর্দ্ধনম্।
বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্॥
সর্ব্বস্নেহোত্তম্ শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিবদ্ ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥

ইহার অর্থ এই—ঘৃত স্মৃতিশক্তির ও বুদ্ধির বৃদ্ধি কারক। নিজে গুরুপাক হইলেও বৃদ্ধি কর। অতিশয় শুক্র বর্দ্ধক, ওজঃ পদার্থের বৃদ্ধিকারী। ইহা কফ ও মেদকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঘৃত বায়ু ও পিত্ত নাশক। অধিকন্তু বিষ, উন্মাদ, ক্ষয় ও জ্বররোগের শান্তিকারক। ইহাতে অলক্ষ্মী দোষও নষ্ট হয়। সকল প্রকার স্নেহ দ্রব্যের মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস ও মধুর বিপাক। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত ঘৃত সহস্রবীর্য্য ও সহস্র কর্ম্মকারক হইয়া থাকে।

তবেই দেখুন, ঘৃত কিরূপ আয়ুষ্কর খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন পবিত্র খাদ্য আজকাল আমাদের দেশে কিরূপ অপবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাবৎ ইহার প্রতিকার না হইবে, তাবৎ মানবের দীর্ঘ জীবনের পথ রুদ্ধ

ব্রহ্মচর্য্য আয়ুর্বর্দ্ধনের একটি প্রশস্ত উপায়। ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর শুক্র সংরক্ষণ।

পূর্ব্বকালে আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সন্তানগণ উপবীত হইয়া গুরু গৃহে বাস করিয়া স্বাধ্যায়নিরত থাকিতেন। তৎকালে তাঁহাদের মদ্য, মাংস ভোজন, কর্পূর চন্দনাদি বিলেপন, মাল্য ধারণ, স্ত্রী জাতির অঙ্গ স্পর্শন এবং প্রাণি হিংসা নিষিদ্ধ ছিল। উপনয়নের পর হইতে বিদ্যা সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাবৎ চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইত, তাবৎ তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হইত। ইহার ফলে দীর্ঘকাল শুক্রধাতুকে অবিকৃত ও অবিচলিত রাখায় তাঁহারা মনোহর কান্তি ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেন এবং সংসারাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক দারগ্রহণান্তে তদুপযুক্ত সন্তান সন্ততিগণকেও হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী করিতেন। কিন্তু হায়! সে দিন এখন গত হইয়াছে। সে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আর নাই। এখন কৌমার কাল হইতেই কদভ্যাসে শুক্র ব্যয় হয়। যৌবনের প্রারম্ভ কালে অসময়ে এখন অনেকে শুক্রব্যয়ে স্বীয় শরীরকে অন্তঃসার শূন্য করেন। যাঁহারা দীর্ঘজীবিতাকাঙ্খী তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যের আভাষ যৎকিঞ্চিৎ প্রকটিত হইল। এইবার দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতেছে। একটি কথা জানা আছে,—

ইহার অর্থ এই—সত্যসংরক্ষণ, গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য সলিলা নদীর জল পান এবং প্রভাতে ভ্রমণ, এই সকল দ্বারা মানব শত বর্ষ জীবী হইয়া থাকে। প্রত্যেক আয়ুষ্কামী ব্যক্তির উপরোক্ত তিনটি বাক্যই দেখা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া রাখা যে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন, তাহা আর সবিশেষ বলিবার আবশ্যক হয় না।

এ পর্য্যন্ত আমরা আহার বিহারাদি ব্রহ্মচর্য্য সদাচার প্রভৃতির দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধির সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা তো পাঠকগণ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ে আরও কিছু বলিয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিব।

শ্বাস প্রশ্বাসও আয়ুর স্থায়িত্বের অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। সাধারণতঃ অহোরাত্রের মধ্যে মনুষ্যগণের ২১,৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কম হইলে মানবের দীর্ঘায়ু এবং উহা অপেক্ষা অধিক হইলে মনুষ্যের অল্পায়ু হইবার কথা।

যোগ শাস্ত্রে লিখিত যাহা আছে—

ইহার অর্থ এই ;—

উঠিতে, বসিতে, খাইতে বেড়াইতে, ধ্যান করিতে, দেখিতে শুনিতে, সর্ব্ব বিষয়েই শ্বাস প্রশ্বাস সংযত রাখিতে পারিলেই মর্ত্ত্যগণ সহস্রায়ুঃ হইতে পারে।

যোগাভ্যাস দ্বারা যোগিগণ যে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন, শ্বাস সংযম তাহার প্রধান কারণ। যোগের প্রথম শিক্ষা প্রাণায়াম। প্রাণায়াম পাদের অর্থ—প্রাণের আয়াম। উহার দ্বারা প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া জীবিত কালের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, এই জন্য ইহারই নাম প্রাণায়াম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে ;—

অপান বায়ুর বিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগমনশীল, এবং অপানবায়ু অধোগামী। বায়ুকে উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে না দেওয়াকেই, অর্থাৎ এক স্থানে স্থিত করাকেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে, শ্বাস বায়ুর নিরোধ করিতে হয়। বায়ু নির্ব্বন্ধ হইলে প্রাণের স্থৈর্য্য সাধনাদি হইয়া থাকে। প্রাণ স্থির হইলে মনও সুস্থির হইয়া উঠে। তখন ধ্যেয় বস্তু সহজেই চিত্তপটে সমারূঢ় হইতে থাকে। তন্নিমিত্ত যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, অগ্রেই প্রাণায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। দীর্ঘ কাল প্রাণায়াম সাধন করিতে পারিলে জরা-মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।

যোগশাস্ত্র বলেন, মানব শরীর আমমৃত্তি-কাময় কলস তুল্য। জীবন জলের ন্যায় এবং যোগ অগ্নির স্বরূপ। সম্পূর্ণ আম কলস যেমন জলপূর্ণ হইয়া অচিরে লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অগ্নি সংযোগ দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিয়া লইলে, উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জীবনযুক্ত কায়ও অনুক্ষণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; যোগ সাধন দ্বারা উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে উহার নশ্বরত্ব নষ্ট হয় সুতরাং বহুকাল বজায় থাকিতে পারে।

যোগাদি দ্বারা শ্বাসসংযোগের ফলে আয়ুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখিত হইল, এই বার রাত্রিকালীন প্রবহমান শ্বাস প্রশ্বাস বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—"মনুষ্য স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার নিশ্বাস বায়ু স্বভাবতঃ নাসিকাগ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি দূর পর্য্যন্ত আইসে। কিন্তু পরিশ্রমের ন্যূনতায় বা আধিক্যে উহা আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। যেমন শয়ন করিলে ষোড়শাঙ্গুলি, ভোজনে বিংশতি পর্য্যন্ত, নিদ্রায় ত্রিংশৎ, মৈথুনে এবং ব্যায়ামে আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছে। স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুলি অপেক্ষা কম হইলে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে, যে, রতি ক্রিয়ায় এবং ব্যায়াম কার্য্যে পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং উক্ত উভয় কর্ম্মই নিরতিশয় আয়ু ক্ষতিকারক। অত্যধিক শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ যে জীবিত কালের খর্ব্বতা সম্পাদক, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারাও কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইতেছে।

নরা গজা বিশে শয়;
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
বাইশ বলদা তের ছাগ্‌লা
ধুঁকে মরে বরা পাগ্‌লা॥

ইহার অর্থ এই—মনুষ্য এবং হস্তী এক শত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক প্রায় প্রায় যাইট বৎসর বাঁচে। বলদ অর্থাৎ মেষ মহিষ প্রভৃতি জন্তু কুড়ি, বাইশ বৎসর এবং ছাগল বার তের বৎসর জীবন ধারণ করে। কিন্তু শূকর সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে, এই নিমিত্ত অধিক কাল জীবিত থাকে না। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়।

শশকগণও প্রায়ই শূকরের ন্যায় স্বল্পায়ুঃ।

যেহেতু উহারা সর্ব্বদাই দ্রুতগামী। এই নিমিত্ত উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও সমধিক বেগে নির্গত হইতে থাকে। এই কারণে উহারা সচরাচর ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই জীবন ত্যাগ করে।

বানর সকল সর্ব্বদাই লম্প ঝম্প করিয়া বেড়ায়। তজ্জন্য উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও অধিক হয়। উহাদেরও জীবিতকাল দীর্ঘ হয় না।

কূর্ম্মনিচয়ের শ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত অল্প। প্রতি মিনিটে ৪।৫ বারের অধিক নহে। উহাদের আয়ুষ্কাল অধিক, ইহারা দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মানবগণের মধ্যে যাহারা স্থূলকায়, তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা সমধিক হইয়া থাকে। এই জন্য পীন বপুঃ মানব প্রায়ই ক্ষীণায়ু।

এক্ষণে পাঠকবর্গ অবিসংবাদিত ভাবে অবগত হইয়াছেন,যে অত্যধিক শ্বাস নির্গমনে অবশ্যই জীবিতকালের ক্ষীণতা সংঘটিত হয়। সুতরাং যদ্যপি সুদীর্ঘ জীবন লাভে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে যে সমুদয় করণীয় ব্যাপারে সমধিক শ্বাস সঞ্চালিত হয়, তাদৃশ কার্য্যে ক্ষান্ত থাকাই সৎপরামর্শ।

আয়ু ক্ষয়ের আর একটি বিশিষ্ট কারণ অতিশয় স্ত্রীসঙ্গ। আমরা সে বিষয়ে পরে অভিমত পরিব্যক্ত করিব।

কয়েকটি বনৌষধি।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

অনংনাস-আনারস, হিং—আনানস্।

আনারস পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই সহজ প্রাপ্য। ইহার পত্রের মূলভাগ (সাদা অংশ) কৃমি রোগে বিশেষ হিতকর। বালক অথবা বয়ঃপ্রাপ্ত সকলের ক্রিমিতেই ইহা প্রযুজ্য।

আনারস পত্রের সাদা অংশ শিলায় কুট্টিত করিয়া রস নির্গত করিবে, তৎ সহ কিঞ্চিৎ মিছরি মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করাইলে কৃমি নষ্ট হয়।

আনারসের মুল চূর্ণ মূত্র কারক ও ক্রিমি দোষ নাশক।

গর্ভবতীকে কখনও আনারস সেবন করাইবে না। আনারস গর্ভস্রাবক। পল্লীগ্রামে প্রবীনা গৃহিণীগণ আনারসের এই গুণ অবগত আছেন, এজন্য তাঁহারা গর্ভবতীকে আনারস সেবন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

পক্ক আনারস চুণের জলে ধৌত করিয়া সেবন করিলে কৃমি ও বমন রোগে বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে। হিক্কা রোগে আনারসের রস উপকারী, পক্ক আনারস মুখ রোচক ও অগ্নি দীপক।

নিগু´ন্তী—, নির্সিন্দা, হিং, ইঞ্চুর।

নিসিন্দা বৃক্ষের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান গুণ কফ নাশক।

কর্ণ রোগে নিসিন্দা—কর্ণ মূল ফুলিলে কিম্বা কর্ণাভ্যন্তরে বেদনা হইলে, কর্ণ মূলে নিসিন্দা পত্র বাসী হুঁকার জলে পেষণ করতঃ সামান্য উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে।

বাত বেদনায় নিসিন্দা—১ তোলা নিসিন্দা পত্র ও অর্দ্ধ তোলা আদা, অর্দ্ধ তোলা সজিনার ছাল একত্রে পেষণ করিয়া সামান্য উত্তপ্ত করিবে। বেদনা স্থানে দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে বাতের বেদনার উপকার হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

রক্ত পিত্তে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্র গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্ত পিত্তের উপশম হয়।

কর্ণ পাকে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্রের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার ২।১ ফোঁটা কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কর্ণের পূয স্রাব নিবৃত্তি হয়।

গণ্ডমালায় নিসিন্দা।—নিসিন্দা বৃক্ষের মূলের ছাল জলে পেষণ করিয়া নস্য টানিলে গণ্ড মালা বিনষ্ট হয়!

শিরোরোগে নিসিন্দা।—মাথা ধরায় কপালে নিসিন্দা পত্রের প্রলেপ দিলে মাথা ধরা নিবৃত্তি হয়।

আঘাতে নিসিন্দা।—আঘাত প্রাপ্ত জন্য দেহের কোন স্থান ফুলিলে নিসিন্দা পত্র বস্ত্র খণ্ডে বাঁধিয়া উত্তপ্ত করিবে, পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করতঃ ঐ পুট্‌লি দ্বারা সেক দিলে ফুলা নিবৃত্তি হয়।

স্নুহী ; মনসা গাছ ; হিং—থূহর,

মনসা গাছ সর্ব্বত্রই পরিচিত, ইহাকে বাঙ্গলার কোন কোন স্থলে সেঁজির গাছ বলিয়া থাকে,—ইহা বহু জাতীয় আছে। অনেকে ফণি মনসাকে মনসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। মনসা গাছের পত্র চওড়া, ডাল গুলি সুগোল ও গাত্রে কণ্টক আছে। ইহার পত্র ও গাত্র কর্ত্তন করিলে তরল আঠা বহির্গত হয়। মনসা গাছের আঠা এবং পত্র ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মজ্জা ক্ষত রোগ নাশক, আটা তীক্ষ্ণ বিরেচক, পত্র বেদনা নিবারক।

জলোদরে স্নুহী ক্ষীর।—আতপ চাউল, মনসার আঠায় ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্দারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে, অত্যল্প কাল মধ্যে উদর রোগ উপশমিত হয়। ইহাতে রোগের উপযুক্ত বিরেচনের কার্য্য করে। মনসার ক্ষীর (আঠা) দ্বারা প্রস্তুতীয় বিন্দুঘৃত উদর রোগের বিখ্যাত ঔষধ।

২ রতি পরিমাণ মনসার আঠা একটী ময়দার ঠুলির মধ্যে পুরিয়া জলের সহিত গিলিয়া খাইলে উত্তম বিরেচনের কার্য্য সাধিত হয়। মনসার আঠা কখনও অতি মাত্রায় ব্যবহার করিবেনা। অতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে অত্যধিক বিরেচনে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদর রোগে মনসার পাতা।—মনসার পাতা সাধারণ শাক প্রস্তুতের ন্যায় রন্ধন

করিয়া সেবন করিলে উদর রোগ উপশমিত হয়।

জ্বর কালীন প্রদাহে মনসা পাতা।—জ্বরেঅত্যন্ত দাহ হইলে, তৎকালীন যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য মনসা পাতা অতি শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। কয়েকটী মনসা পাতা অগ্নি সন্তাপে উত্তপ্ত করিয়া নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে, কিছু ধনে চূর্ণ ঐ রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, তৎপর কতকগুলি লম্বা দূর্ব্বা দ্বারা একটী গুচ্ছ বাধিয়া ঐ দূর্ব্বাগুচ্ছ,মনসা পাতার রসে ভিজাইয়া ঐ রস রোগীর সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ ছিটাইয়া দিবে, ইহাতে প্রবল দাহ ক্ষণকাল মধ্যে নিবৃত্ত হইবে। এরূপ দাহ নিবারক ঔষধ অল্পই দৃষ্ট হয়।

বেদনা নিবারণে মনসা পাতা।—কোন স্থান ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে মনসা পাতা, সৈন্ধব লবণ ও ধুতুরা পাতা একত্রে পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করতঃ প্রলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা নিবৃত্তি হয়।

দন্তপোকায় মনসা পাতা।—দাঁতে চর্ব্বন করিলে দন্ত পোকা পতিত হয়।

সর্প দংশিত ব্যক্তিকে মনসার মূল সেবন করাইলে বিষ নিবৃত্তি হয়।

বাত গুল্মে মনসা আঠা।—মনসার আঠায় তেউড়ী মূল চূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও গব্য ঘৃত সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে উৎকৃষ্ট বিরেচন হয়। রোগীর বল অনুযায়ী এই বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অতি বিরেচনে রোগী নিস্তেজ হইয়া থাকে।

মনসার আঠা অতি সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ইহা দেহের কোন স্থানে লাগিলে অগ্নি দগ্ধের ন্যায় ফোস্কা পড়ে।

মনসার মজ্জা গব্য ঘৃতে তীক্ষ্ণরূপে ভাজিয়া লইবে, ঐ ভর্জ্জিত মজ্জা সামান্য তুঁতে ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই রূপে যে মলম প্রস্তুত হইবে তাহা দূষিত ক্ষতাদি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরমির দূষিত ক্ষত পর্য্যন্ত ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে।

পরিভাষা।

ভিষবর স্বর্গীয় শ্রীকণ্ঠ দাস বিরচিত "পরিভাষা সংগ্রহ" নামক পুস্তক খানি কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংপ্রতি বাহির হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক খানি অবলম্বন করিয়াই আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষার কথা বলিব।

আয়ুর্ব্বেদের প্রায় অর্দ্ধাংশই পরিভাষা। পরিভাষা না জানিলে ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদির পাকবিধি, ঔষধ সেবনের কাল ও মাত্রা নির্ণয়, অনুপান বিধি, ভাবনা বিধি, এ সকল সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। এই পরিভাষা গ্রন্থ সম্বন্ধে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

ধ্বান্তে পথি চরিষ্ণূনাং যথা দীপঃ প্রদর্শকঃ।
নানা শাস্ত্রজ্ঞ ভিষজাং সংগ্রহোঽয়ং
তথা ভবেৎ॥

অর্থাৎ যেরূপ অন্ধকারে ভ্রমণ কালে প্রদীপ দ্বারা পথ প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ নানা শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যদিগের পক্ষে এই "পরিভাষা সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশের পথ প্রদর্শক হইবে।

এই গ্রন্থের পরিচয়ে সংগ্রহকারের আরও পরিচয়—

অনুক্তাব্যক্ত লেশোক্ত সন্দিগ্ধার্থ প্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥

অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত, অনুক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে।

শুধু সংগ্রহকারের কথা নহে, প্রকৃত পক্ষে পরিভাষা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—পরিভাষায় জ্ঞান না থাকিলে ঔষধাদি প্রস্তুত যে করিতে পারা যায় না—ইহা সুনিশ্চিত। তবে যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মূল গ্রন্থ গুলি ভাল করিয়া পড়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে পরিভাষার বিষয় গুলি সেই সকল গ্রন্থেই শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা গ্রন্থ গুলি হইতেই ইহা সংগৃহীত,—সংহিতাগুলির কথা ভিন্ন ইহাতে নূতন কথা অল্পই আছে।

শ্রীকণ্ঠ দাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" ভিন্ন গোবিন্দ দাসের একখানি "পরিভাষা প্রদীপ" বৈদ্য সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

পূর্ব্বৈ র্মুনিভিরাদিষ্টা স্বে স্বে তন্ত্রে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
পরিভাষা ময়া সা সা সমাহৃত্য বিলিখ্যতে॥

অর্থাৎ প্রাচীন মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সকল পরিভাষা বিক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীকণ্ঠ দাসও এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রাক পারিভাষিক বচো মুনিভিঃ প্রণীতম্
যন্মাধবাদি লিখিত ংস্ববহু প্রপঞ্চম্।
সংক্ষিপ্যতে নবক বৈদ্যহিতায় যস্মাৎ
শ্রীকণ্ঠদাস ভিষজা তদনুক্রমেণ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনিগণ কর্ত্তৃক যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় পারিভাষিক বাক্য রচিত হইয়াছে, এবং যাহা মাধবাদি গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম নবীন বৈদ্যদিগের হিতকল্পে শ্রীকণ্ঠদাস কর্ত্তৃক বহু যত্ন সহকারে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্র জ্ঞান, ভুয়োদর্শন, রোগনির্ণয় ও যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা-বিধান যেরূপ প্রয়োজনীয়, যথা নিখুঁত ভাবে ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাকরণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজনীয়। পরিভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন না হইলে দ্রব্য সকলের পরিমাণাদি, ঔষধাদির প্রস্তুতবিধি, তৈল ঘৃতাদির পাক প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না—এজন্য পরিভাষার শিক্ষা লাভ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

শ্রীকণ্ঠদাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" এবং গোবিন্দ দাসের "পরিভাষা প্রদীপ"—এই উভয় গ্রন্থই প্রায় এক ধরণে সংগৃহীত। দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উভয় গ্রন্থেই প্রথমে "মানের" কথা। "মানের" কথা তো লিখিতেই হইবে, কারণ "ন মানেন বিনা যুক্তি দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।'

অর্থাৎ পরিমাণ ব্যতীত কোনো দ্রব্যের প্রয়োগে ফল লাভ হয় না। কিন্তু এই "মান" পরিভাষায় উভয় গ্রন্থের সংগ্রহকারই যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে

বৈদ্য সমাজে তাহার প্রচলন্ নাই। উভয় গ্রন্থেই সুশ্রুত ও চরকের "মান" লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংশ্রুতের 'মান'কে কালিঙ্গ মান এবং চরকের 'মান'কে মাগধ মান বলিয়া সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত। এই দুইটি 'মানে' অনেক প্রভেদ কালিঙ্গ 'মানে' পাঁচ রতিতে মাষা এবং মাগধ "মানে" দশ রতিতে এক মাষা। এখনকার দিনে কিন্তু এই দুইটির একটিও গ্রহণ না করিয়া ছয় রতিতে আনা এবং বার রতিতে মাষা গণনা করা হয়। সুতরাং কালিঙ্গ এবং মাগধ দুইটি "মানের"ই পরিবর্ত্তিত ভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য নূতন "মানের" ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোবিন্দদাসের "পরিভাষা প্রদীপে" একই বিষয় বলিতে গিয়া বহু স্থলে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষ সংগ্রহে" সে দোষ বড় নাই। কিন্তু গোবিন্দদাসের "পরিভাষা প্রদীপ" যেরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সাজান, শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষা সংগ্রহ" সে ধরণের নহে। অযুক্ত, অব্যক্ত, লেশোক্ত, বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস করিয়া এই পরিভাষা সংগৃহীত। এক হিসাবে এই শ্রেণীবিন্যাস উৎকৃষ্ট হইলেও গোবিন্দদাসের খণ্ড বিন্যাস শিক্ষা কল্পে সুগম হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গোবিন্দদাসের "পরিভাষ প্রদীপে" লৌহ শোধনাদির কথা যাহা লিখিত আছে, শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষা সংগ্রহে" তাহা লিখিত হয় নাই। শ্রীকণ্ঠ শুধু লৌহের পাক লক্ষণই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শোধন ও মারণ—যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন, এজন্য শিক্ষার্থি দিগের পক্ষে ইহা অসম্পূর্ণ হইয়াছে। স্নেহ পাক সিদ্ধির প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস যেরূপ ক্ষতাদিতে যে সকল ক্ষারসাধ্য জল পাক করিতে হয় তাহার পরিচয়ে—

অগ্নিম্নবসরে তোয়ং ক্ষার সাধ্যং ক্ষতাদিষু।
ফেনোদয়স্ত নিপত্তিন ৪ দুগ্ধ সমাকৃতি ॥

বলিয়া উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠ তাহা করেন নাই, সুতরাং শিক্ষার্থির পক্ষে ইহাও বাদ পড়িয়াছে। তবে এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না, দুইখানি পরিভাষা সংগ্রহই যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছে এখনকার যুগে তাহার কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বর্ত্তমান যুগে এমন একখানি পরিভাষা সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা প্রথম শিক্ষার্থির পক্ষে সহজ বোধ্য হয়। পঞ্চকর্ম্ম বা বমন, বিরেচন, নিরূহন, অনুবাসন ধূমপান, কবল ও রক্ত মোক্ষন প্রভৃতি বিষয় গুলি পরিভাষা সংগ্রহে সন্নিবেশ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি না, কারণ চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষা না করিলে এ সকল বিষয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। এজন্য আমাদের মতে নূতন কোনও সংগ্রহ-কার পরিভাষা সংগ্রহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার সংগ্রহ পুস্তকে ঐ বিষয়গুলির সংযোজনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীকণ্ঠ দাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" যাহা কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সংপ্রতি বাহির করিয়াছেন, তাহার কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট, বঙ্গানুবাদও উত্তম হইয়াছে কিন্তু ৭ ফর্ম্মা পুস্তকের মূল্য যাহা তিনি ১৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনার তাহা বেশীই হইয়াছে। ৭ ফর্ম্মা পুস্তকের মূল্য

।০ আনা করিলে সুসঙ্গত হইত। যাহা হউক ভিষগ্বর শ্রীকণ্ঠ দাসের সংগৃহীত এই লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত কবিরাজ দীনেশচন্দ্র বৈদ্যসমাজে প্রশংসার পাত্র।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কথা।

আয়ুর্ব্বেদানুরাগী বক্তি মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংপ্রতি শ্যামবাজার পার্কের সম্মুখে প্রায় দেড় বিঘা জমি দান করিয়াছেন। এই জমীর উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বোর্ডিং—সমস্তই এই জমীতে হইতে পারিবে। ইহার জন্ম অন্ততঃ আট লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা এই সদনুষ্ঠানের জন্ম দেশের দানশীল-মহাত্মাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহার যেমন শক্তি, তিনি তদনুসারে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। "দশের লাঠি, একের বোঝা"—এই চলিত কথার অনুসরণ করিয়া যিনি যাহা দান করিবেন, আমরা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব।

কলেজে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল—ফড়িয়া পুকুরের বাটীতে আর ইহার স্থান সংকুলান হইতেছিলনা। এই জন্ত সংপ্রতি এই বিদ্যালয় ১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রিজরোডস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত নূতন জমীতে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই নূতন বাটীতে বিদ্যালয় ও হাস-পাতালের কার্য্য চলিবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যেরূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়েও প্রত্যহ সেইরূপ রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ কাল প্রায় একশত রোগী ইহার শল্য ও কায় বিভাগে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্ম এই বাটী পরিবর্ত্তনে সাধারণের পক্ষে সকল দিকেই সুবিধা করা হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন,
এম-এ, এম-বি,
প্রিন্সিপাল।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদে অ্যানাটমী।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি,]

—— :*: ——

চরকের বহুকাল পরে সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল। চরক প্রণীত হইয়াছিল সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে। সুশ্রুত রচিত হইয়াছিল – এখন হইতে কিঞ্চিদধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। চরকের উপদেষ্টা দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুশ্রুতের উপদেষ্টা প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্র না হইলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসার মূল উপদেষ্টা ইন্দ্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয় হইতে অমর নাথ ইন্দ্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যেমন মহর্ষি ভরদ্বাজকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ ধন্বন্তরিকেও ইহার শিক্ষা দান করেন। ধন্বন্তরি, দিবোদাসরূপে বারাণসী ধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পুষ্কলাবত প্রভৃতিকে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। ইন্দ্র, ভরদ্বাজকে চিকিৎসার যে অঙ্গের শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা কায় চিকিৎসা প্রধান, সেই জন্য চরক—কায় চিকিৎসা প্রধান শ্রেষ্টসংহিতা এবং ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের আট অঙ্গেরই শিক্ষা লাভ করিয়া সুশ্রুত প্রভৃতিকে উহার উপদেশ প্রদান করিলেও উহাতে শল্যতন্ত্রের উপদেশই বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা শল্য প্রধান শ্রেষ্ঠ সংহিতা। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে শল্য চিকিৎসা বিলুপ্ত হইলেও উহা যে আর্য্য চিকিৎসার মধ্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তাঁহার হিন্দু সিষ্টেম অব মেডিসিন নামক গ্রন্থের